BANGLA KOUNTERKULTURE ARCHIVE MAGAZINE

ODDJOINT

009/JULY 2017

জাত আছে, জাতের নামে	সুব্রত ঘোষ	৩
কথাবার্তা	আশিস অভিকুন্তক	৮
এই শহরে একলা মেয়ে	নন্দিনী সোনালী	২৮

কভার ফটো : কিউ

ODDJOINT # বাংলাব্ল্যাক

Bangla Kounterkulture Archive | curation Q| Surojit | Sucheta volunteers Suman | Avishek

কালান্তর - কাজের খোঁজে দেশ ছেড়েছে শ্রমিক। চাষে লাভও কমেছে।
নিজের ক্ষেতে কাজে ব্যস্ত এক ব্রাহ্মণ

জাত আছে, জাতের নামে সুব্রত ঘোষ

"সর্বজয়া ডালের বাটি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। বাটি মেজেতে নামাইয়া সামনে বসিয়া পড়িল। বলিল-হ্যাঁগো, তা মন্দ কী? দাও না ওদের মন্তর? কী জাত? হরিহর সুর নামাইয়া বলিল--বোলো না কাউকে --সদগোপ । তোমার তো আবার গল্প করে বেড়ানো স্বভাব—-"

পথের পাঁচালী (১৩৩৬), বল্লালীবালাই, অষ্টমপরিচ্ছেদ

আমরা সদগোপ। হিন্দু মতে শূদ্র। সৎ শূদ্র। গোয়ালা ঘোষ না, চাষা ঘোষ। এসসি ওবিসি নয়, জেনারেল। 'চাষা যে রাস্তায় হাঁটে, দশ বছর সে রাস্তায় হনুমান হাঁটে না'- শুনে বড় হয়েছি। তারাশঙ্করের লেখায় পড়েছি, বামুন বাড়ির মেয়েরা বলছে, খাবারগুলো ফেলিস না, সকালে সদগোপদের বাড়ির মেয়েদের দিয়ে দিস। যতই সম্পন্ন চাষি হইনা কেন ট্র্যাডিশনাল হিন্দু মতে ছোট জাত। গোটা গ্রামটাই সদগোপদের হওয়ায় জাতপাতের ভেদ আম্বেদকরের মত হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি এমন নয়। তবে কিছুটা দেখেছি।

বাগদী দুলে মুচি মাহাত জেলে সাঁওতাল পরামানিকরা পাশে থেকেও যে আমাদের চেয়ে নিচু জাতের এমন একটা ধারণা অবচেতনেই তৈরি হয়েছিল দেখে দেখে। কেননা ওরা উঠোন থেকে দুয়ারে ওঠে না, ঘর তো দুরস্থান। কাজ করার সময় ঢুকতে পারে ঘর মুছতে। বাসন মাজতে পারে। কিন্তু একাসনে খেতে পারে না। ওদের থালায় বা হাতে কোন জিনিস একটু উঁচু থেকে ছেড়ে দিতে হয়। খাওয়ার শেষে নিজের

জায়গা নিকিয়ে ধুয়ে দিতে হয় থালা। খেঁদি বাগদীর বাড়ি আমাদের বাড়ির দশ হাত দূরে। সে ভিক্ষা করেই দিন কাটাত। মাঝে মাঝে খেয়ে যেত দুপুরে। বয়স হয়েছিল। জল নিতে এলে মা কল পাম্প করে দিত। তখন আমাদের বাড়ির কাজের লোক বলতে ছিল জয়ন্তীদি। একদিন মা ঠাকুরঘরে ব্যস্ত, খেঁদিপিসি এল জল নিতে। তখন জয়ন্তীদি কল পাম্প করে দিতে গেলে সে বলল 'আমি জল নেব না দুলের হাতে।' কেননা দুলেরা নাকি বাগদিদের চেয়েও ছোট জাত। আমাকেই সেদিন কল পাম্প করে দিতে হয়েছিল। মরণকালে প্রতিবেশী সাঁওতালদের হাতেও জল খায়নি খেঁদিপিসি। সাঁওতালের হাতে জল খেলেও নাকি তার জাত যাবে। মাকে যেতে হয়েছিল শেষের কদিন সাহায্য করতে।

অনেক ছোটবেলায়, টু থ্রিতে পড়ি, একদিন ঘোষেদের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে গেছি। একটা সারিতে বসেছি বন্ধুরা। টেনে তোলা হল আমাদের কয়েকজনকে। বাগদী সাঁওতালদের ছেলেরাই তখন আমার সহপাঠী। বামুন, সঞ্জয়, নিতাই, টিপু। ঐ সারিতে নাকি ব্রাহ্মণরা বসেছে কয়েকজন। বাচ্চা ছিলুম। বুঝিনি। দিব্বি অন্য সারিতে সবাই মিলে খেয়ে চলে এসেছি। চক্রবর্তীদের বাড়ি ঠাকুর দেখতে গিয়ে মা ভুল করে ছুঁয়ে ফেলেছিল ব্রাহ্মণ গিন্নিকে। অবেলায় স্নান করে এসেছিলেন সেই মহিলা বিশুদ্ধ শূদ্রের ছোঁয়াচ ধুয়ে ফেলতে। ব্রাহ্মণদের বাড়ি খেতে গেলে নিজের পাতা নিজেকে ফেলে জায়গা নিকিয়ে দিয়ে আসতে হত। এই প্রথা ছোটবেলায় আমিও দেখেছি, আচারটি পালনও করেছি। বাবার ছোটবেলায় নিয়ম ছিল ভোজ বাড়িতে ব্রাহ্মণে রান্না করবে, ব্রাহ্মণে পরিবেশন করবে। ব্রাহ্মণরা খেতে বসে অনুমতি দিলে তবে অন্যরা বসবে। অনুমতি নিতে হত গ্রামের মোড়লের কাছ থেকে। এখন শুধু প্রথাটা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে টিকে আছে। প্রতিবেশী গাঁয়ের কলু সম্প্রদায়ের একজন প্রতিপত্তি হওয়ায় রথ এনে হইচই ফেলে

ভোজের আসরে একাসনে অপেক্ষা

প্রতিবেশী গাঁয়ের কলু সম্প্রদায়ের একজন প্রতিপত্তি হওয়ায় রথ এনে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন এলাকায়। তাকে নিয়ে প্রবাদ তৈরি হয়, ‘কি ছিনু কি হনু/ তক্তপোষে সনু/ ঠকঠকিয়ে মনু’। কিন্তু লোকে বলেছে ‘তুই সাদখা(সাধুখা) ছিলি সাদখাই আছিস।’কারণ কলুরা নিচু জাত। কাজে এলে সাঁওতাল বাগদীদের গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হত গঙ্গাজল। দর্শনী প্রথার চল ছিল আমার ছোট বেলাতেও। সামাজিক স্তরগুলি নিজের জাত বাঁচাতে অন্যের বাড়ি খেত না। সাজানো খাবার দাঁড়িয়ে দেখে আসত।

মিড ডে মিল- জাতপাত মেটাতে বড় ভূমিকা নিচ্ছে

দিয়েছিলেন এলাকায়। তাকে নিয়ে প্রবাদ তৈরি হয়, ‘কি ছিনু কি হনু/তক্তপোষে সনু/ঠকঠকিয়ে মনু’। কিন্তু লোকে বলেছে ‘তুই সাদখা(সাধুখা) ছিলি সাদখাই আছিস।’কারণ কলুরা নিচু জাত। কাজে এলে সাঁওতাল বাগদীদের গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হত গঙ্গাজল। দর্শনী প্রথার চল ছিল আমার ছোট বেলাতেও। সামাজিক স্তরগুলি নিজের জাত বাঁচাতে অন্যের বাড়ি খেত না। সাজানো খাবার দাঁড়িয়ে দেখে আসত। ব্রাহ্মণরা খাবার দেখে প্রণামী নিত হাত বাড়িয়ে। সদগোপরা বা কায়স্তরা দুলে বাগদী বা কুলিদের বাড়ি গিয়ে খাবার দেখে এলেই সবাই খুশি হত। ধোপারা অনুষ্ঠানে সিদে দিয়ে যেত উচ্চবর্ণের বাড়িতে। বারোয়ারী পূজায় সব শ্রেণীর চাঁদা নেওয়া হলেও মন্দিরে ওঠার অনুমতি ছিল না, মূর্তি ছোঁয়ার বা জোগাড়ে হাত লাগানোর তো কথাই নেই।

যে ডোম ধরমপূজার ব্রাহ্মণ, তারই অনুমতি নেই পাড়ার মন্দিরে পূজা করার। এককালের ক্ষত্রীয় বাগদী নিকনো জায়গায় এসে দাঁড়ালে আবার ধুয়ে মুছে গঙ্গাজল ছেটাতে হয় এখন। নিম্নবর্ণের যত ধূম তাই গাজনে, ধরম পূজোয়, মনসা পূজোয়। ওরা নিজেরাই সেখানে পুরোহিত। আমাদের বাড়ি থেকে এখনও বাৎসরিক পূজা যায় হাজরা বাড়ির মনসা পূজায়, প্রতিবেশী গ্রামে কালা রায়ের (ধর্ম ঠাকুর) থানে। গ্রামের সর্বজনীন দুর্গোৎসবের বারোয়ারী কমিটিগুলিভেঙে ক্লাব ভিত্তিক হওয়ার অনেক কারণের মধ্যে একটা কারণ জাত পাত। প্রতিদিন ছোট হয়ে বাঁচার পরআত্মসম্মান কে হারাতে চায় উৎসবের দিনে?

একমাত্র সংকীর্তনের আসরে আজও সবার প্রবেশাধিকার দেখি। সেখানে সদগোপ, কায়স্থ, জেলে, দুলে, বাগদী, হাড়ি, মুচি, ডোম পাশাপাশি বসে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে গোষ্ঠলীলা শোনে। শোনে আক্ষেপানুরাগ। শচীমা'র হাহাকারে ভাসে। জয় মহাপ্রভু ধ্বনি তোলে। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে নিতাই গৌর সেজে চাষির ছেলেরা বাড়ি বাড়ি গেলে তার পা ধুইয়ে প্রণাম করে সবাই। বাড়ি বাড়ি মানে সর্বার্থেই প্রত্যেকের বাড়ি। পাঁচশ বছর আগের একটা মহতি চেষ্টা চলমান পথ নাটকের রূপে বাঁধা আছে এই চিরায়ত নগর ভ্রমণে। সদগোপ কায়স্থ, দুলে, বাগদী, হাড়ি, মুচি, ডোম, দু হাত তুলে নাচতে নাচতে পথ চলে। নারী - পুরুষ ভেদটাও কীর্তনের আসরে কম। খোল করতাল খঞ্জনী বাজে- "গোরার দুনয়নে বহে প্রেম ধারা।/আমাদের নগর ভ্রমণে যায় গোরা।।" ধুলটের সময় ভাঙা দইয়ের হাঁড়ির একটু টুকরো নিতে যাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, আসর ভাঙলে সেই তারাই আবার বর্ণভেদ মেনে দিন যাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পাশের কৈবর্ত প্রধান গ্রামে গিয়ে নামগান শোনা যায়, আত্মীয় কুটুম্বতা পাঠানোর কথা আর ভাবাই যায় না।

নিজের উচ্চবর্ণে গর্ব বোধ করা এক। সেই বর্ণাভিমান সমাজের পাঁচজনে মেনে না নিলে আর এক। 'সদগোপ সুহৃদ' নামের মাসিক পত্রিকা(১৩১০) বের করতেন শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ। শ্রী মোক্ষদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী একশ বছরেরও আগে লিখেছিলেন 'সদগোপ কুলীন সংহিতা'(১৩২০)। জীবনের ৩৫ বছর ব্যয় করে মোক্ষদাপ্রসাদ এই গ্রন্থে প্রমাণ করেন যে সদগোপ আসলে বৈশ্য-বর্ণ। ব্রাহ্মণ তথা বর্ণহিন্দুদের মত সামাজিক সম্মানের লোভ হওয়াটা স্বাভাবিক। বোধ করি সমাজের উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্গকে স্মরণ করিয়ে দিতেই মনু, মহাভারত, যাজ্ঞবল্ক, পরাশরসংহিতা থেকে তিনি দেখান পশুপালক চাষা'রাই বর্ণ মতে প্রকৃত বৈশ্য। ("পশূনাংরক্ষনংদানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।/ বণিকপথংকুসীদঞ্চবৈশ্যস্যকৃষিমেবচ"।।(১/৯০) মনু সংহিতা) মধ্যযুগে যে কৌলীন্যপ্রথা আঁকড়ে ব্রাহ্মণরা সম্মান উদ্ধারের চেষ্টায় লাগেন সেই কৌলীন্য প্রথা জাপটে ধরেই জাতে উঠতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কায়স্থ, বৈদ্য, সদগোপরা। উনবিংশ শতকের গোড়ায় তো খোদ বিলাতের প্রিভিকাউন্সিল সদগোপদের'সদগোপ-ব্রাহ্মণ' স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু শেষ বিচারে বাংলায় ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সবাই শূদ্র। কারণ ব্রাহ্মণ ছাড়া চতুর্বর্ণের প্রকৃতক্ষত্রীয় ও বৈশ্য বাংলায় নেই। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'মতে আছে সঙ্কর ও অন্ত্যজ। জেমস ওয়াইজ আরও কঠিন করে বলেছিলেন, "বঙ্গদেশের হিন্দুরা নিজেদের খাঁটি হিন্দু বলে দাবী করেন। অথচ উত্তর ভারতের হিন্দুরা এ কথা মানতেই চান না যে বঙ্গদেশের হিন্দুদের সঙ্গে তাদের

একাসনে ভোজের আসরে

দাবী করেন। অথচ উত্তর ভারতের হিন্দুরা এ কথা মানতেই চান না যে বঙ্গদেশের হিন্দুদের সঙ্গে তাদের কোনরূপ সম্পর্ক আছে।" এমনকি বাকি ভারত বাংলার ব্রাহ্মণকেও সমমর্যাদা দিতে পিছপা হয়। এই জাতি ভেদ মোছার চেষ্টা যেই করেছেন তাকে সামাজিক গঞ্জনার শিকার হতে হয়েছে। কর্তাভজা বা মতুয়ারা তো আর এমনি এমনি সৃষ্টি হয়নি। 'জাত মেরেছে তিন সেনে/ স্টেশনে, উইলসেনে ও কেশবসেনে'- দেড়শ বছর আগের এই প্রবাদ কোলকাতা কেন্দ্রিক। বাকি বাংলার গ্রাম সমাজের গভীরে ঢুকে থাকা জাত পাতের ভেদ কাটতে এখনও পাঁচ-দশ দশক লাগবে মনে হয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি থাকলে জাত নির্বিশেষে এখন সম্মান পায় যথাযথ। এক টেবিলে বসে বামুন বাগদীর খাওয়াটা পরিচিত দৃশ্য। কেউ কাউকে উঠিয়ে দেয় না। তবে অনেকে লোক দেখেই বসে। মানে জাত দেখে। 'পাশের সিটটা ভালো' বলে উঠে গিয়ে বসে। কর্মসূত্রে বীরভূমে থাকি। সেখানে সামাজিক ভাবে ছোট জাতের মানুষকে অনুমতি নিয়ে উচ্চবর্ণের পাশে বসতে দেখেছি। অধিকাংশ সময়েই অন্যত্র খেতে দেওয়া হয়। খাওয়া হয়ে গেলে জায়গা নিকনো ও এঁটো বাসন ধুয়ে দেওয়ার দায়িত্বও যে খেল তার। সম্প্রতি খোল-বাদক ব্রাহ্মণ-যুবক ও কীর্তনিয়া ডোম-যুবতীর প্রণয় সূত্রে বিবাহ সমাজ মেনে নিলেও ব্রাহ্মণ পিতা প্রথমে মেনে নেননি। সাঁওতাল মেয়ে বাগদীদের ছেলের সাথে চলে যাওয়ায় মাঝিদের মিটিং বসে ফয়সালা করতে। এই জাতপাত হীন(?) পশ্চিমবঙ্গেই সরকারকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল মিড ডে মিল চালু করতে। জাতের ফাঁদে আটকে থেকেই মিড ডে মিল খায়না এখনও অনেক বড় বাড়ির ছেলে মেয়ে। অঙ্গনওয়ারিতে খাবে খাবে না করে অধিকাংশই খাচ্ছে। ভোটের ডিউটিতে গিয়ে স্বয়ম্বর গোষ্ঠীর মেয়েরা ছোট জাত বুঝেই চিড়ে ভিজিয়ে খেয়ে দুদিন কাটিয়ে দিয়েছেন আমার সহকর্মী পোলিং অফিসার। সময় অনেক বদলে গ্রামের পাশে রিলায়েন্সের ফোর জি টাওয়ার বসেছে মানে এই নয়, যে, আত্মীয় কুটুম্ব পাতাতে শুরু করেছে বামুনে বাগদীতে। তিন দশক আগে সদগোপ ও ব্রাহ্মণ পরিবারের এমন একটি প্রণয় ঘটিত বিয়ের পর গ্রাম ষোলো আনায় মিটিং ডেকে ভট্টাচার্য মশাইকে অনুরোধ করা হয়েছিল জামাইকে স্বীকার করে নিতে। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। জাতের নামে আমরা আলাদা ছিলাম, আলাদাই আছি।

যানবাহন ছাড়া এক পা চলে না আজকাল

নবশাখদের যারা পূজা করে তারা নাকি শূদ্র বামুন। অগ্রদানী ব্রাহ্মণরা আরও নিচু। পিণ্ড ভক্ষণ করে কিনা তারা। তাদের সাথে এক আসনে খেলে খাঁটি ব্রাহ্মণের জাত যায়। ‘লাঙলা বামুন’ হল তারা যারা পৌরোহিত্য ছেড়ে কৃষিতে মন দিয়েছে, অতএব জ্ঞাতিদের চোখে তারা ঘৃণ্য। আরও ভেদ দেখতে চাইলে পাত্র পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখুন আনন্দবাজারে। এই জাতিভেদ ঘুচিয়ে বাঙালীকে রক্ষা করতে পথে নেমেছে দৈনিক পত্রিকা ‘এই সময়’- ‘জাত ধর্ম উল্লেখ ছাড়া বিয়ের বিজ্ঞাপনে

সৎ শূদ্রদের মধ্যে কুমার, রায় প্রমুখরা সবচেয়ে উঁচু। এর পরে মিত্তির, গুহ, ঘোষ, বোস। “ঘোষ বংশ বড়ো বংশ, বোস বংশ দাতা।/মিত্র বংশ কুটিল বংশ, দত্ত হারামজাদা।” কুলীন কায়স্থ এরা। সবাই শিক্ষিত। ‘কলমে কায়স্ত চিনি/ গোঁফেতে রাজপুত’- প্রবাদ ছিল না! মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ‘জাত কাছারী’ বানিয়ে অনেক জাতের লোককেই ‘কায়স্থ’ স্বীকৃতি দেন। কায়স্থদের উচ্চবর্ণ নিয়ে প্রশ্ন করবে কে! তাদের অনেকের পরে তো সদগোপরা। শূর, নিয়োগী, বিশ্বাসরা হল কুলীন সদগোপ। তারও পরে 'সানা পানা রাণা/তিন থাকতে মানা।' তারও পরে নাকি বাগদী, দুলে, ডোম, মুচি, মেথর ইত্যাদি ইত্যাদি। বামুনদের মধ্যেও ভেদ দেখেছি। পূজারী ব্রাহ্মণরা নাকি নিম্ন শ্রেণীর। নবশাখদের যারা পূজা করে তারা নাকি শূদ্র বামুন। অগ্রদানী ব্রাহ্মণরা আরও নিচু। পিণ্ড ভক্ষণ করে কিনা তারা। তাদের সাথে এক আসনে খেলে খাঁটি ব্রাহ্মণের জাত যায়। ‘লাঙলা বামুন’ হল
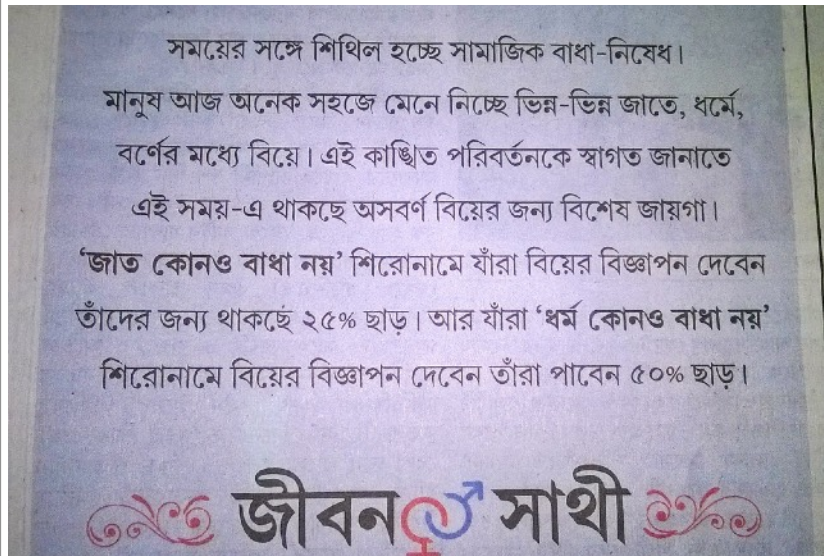
এই সময় খবরের কাগজে অভিনব বিজ্ঞাপন

তারা যারা পৌরোহিত্য ছেড়ে কৃষিতে মন দিয়েছে, অতএব জ্ঞাতিদের চোখে তারা ঘৃণ্য। আরও ভেদ দেখতে চাইলে পাত্র পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখুন আনন্দবাজারে। এই জাতিভেদ ঘুচিয়ে বাঙালীকে রক্ষা করতে পথে নেমেছে দৈনিক পত্রিকা ‘এই সময়’-‘জাত ধর্ম উল্লেখ ছাড়া বিয়ের বিজ্ঞাপনে ২৫%-৫০%

ছাড়' দিতে শুরু করেছে দৈনিকটি। চতুর্বর্ণ বিভাজন ব্যবস্থা বাংলায় কখনই ছিল না বলে দাবী করেন ঐতিহাসিকরা। বাংলার জাতিভেদ সঙ্করত্বের কারণে তৈরি হয়েছে। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' মতে ব্রাহ্মণ ছাড়া বাংলায় আছে উত্তম সঙ্কর, মধ্যম সঙ্কর এবং অন্ত্যজ। সেই মতেই বাংলার পঞ্চবর্ণ ব্যবস্থা- ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ ও অন্যান্য জাতি। তিলি-তাঁতি-মালাকার-সদগোপ-নাপিত-বারুই-কামার-কুম্ভকার-মোদক - এরা হল নবশাখ, কারণ এঁদের হাতে ব্রাহ্মণরা জল খায়। বাকি সব জাতির হাতে জলস্পর্শ চলে না। এই ভেদকে মান্যতা দিয়েছিল ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থদের কুলজী গ্রন্থগুলি। কুলজীলিখেও ব্রাহ্মণ হতে পারেনি এরা এই যা আক্ষেপ! তারপরেও অনেকে বলেন বাংলায় জাতি ভেদ নেই! প্রশ্ন হল বাংলায় জাতিভেদ যদি নাই থাকে তবে চর্যাপদে উল্লিখিত ডোম চণ্ডাল কাপালিককে কেন নিম্নস্তরের, কেন গ্রামের বাইরে তাদের বাস? শ্রীচৈতন্য 'পতিত হেরিয়া' কেঁদেছিলেন কেন? যাদের দেখে কেঁদেছিলেন সেই পতিত কারা, অন্ত্যজ কারা? কেশব সেন ব্রাহ্ম সমাজে সব শ্রেণিকে আহ্বান জানালে কেন 'গেলগেল' রব উঠেছিল সমাজে? পাঁচশ বছর পরে কেন মাত্র সাড়ে তিন দশকের জীবন যাপনে এত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় আমাকে? কেন এই ২০১৭র এপ্রিল মাসে সুভম রুইদাসের চরণামৃত বিতরণকে অপরাধ বলে চিহ্নিত করে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসরুই গ্রামের উচ্চবর্ণের প্রতিনিধিরা ১৫টি রুইদাস পরিবারকে একঘরে করে? কেন নদীয়ার করিমপুরের মন্টু দাস আর অনিমা প্রামাণিক অসবর্ণ বিয়ে করতে চেয়ে থানায় ধর্না দেয়? চতুর্বর্ণ ভেদ মতে বাংলার জাতিভেদ যদি নাই হবে তবে চতুর্বর্ণের সর্বোচ্চ স্তরে এদের অন্তর্ভুক্তি করণে বাধা কোথায়?

নীচু জাতের মানুষের সঙ্গে কথা বললেই জরিমানা পাঁচশো টাকা

সামাজিক বয়কটে শালবনির পাথরাজুড়ির ২০ পরিবার

দের জমিতে কেনও লোক সেচ দেবেন না বা কাজ করবেন না। কোনও গ্রামীণ চিকিৎসক সিং-দের চিকিৎসা করবেন না। এমনকি দোলই পাড়ার কেউ সিং-পাড়ার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বললেও পাঁচশো টাকা জরিমানা। সমস্ত দিক থেকে এই সামাজিক বয়কট চলছে প্রায় পঁচিশ দিন ধরে। দোলই পাড়াতে রয়েছে স্থানীয় প্রধান শ্যামসুন্দর দোলই। তিনিও নাকি দোলই পাড়ার হয়ে কাজ করছেন। পরিস্থিতি নিয়ে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকেও লিখিত ভাবে জানিয়েছেন গ্রামের সিংপাড়ার বাসিন্দারা। কিন্তু সুরাহা মেলেনি। স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজিৎ সিং বলেন

সামাজিক বয়কটের কারণে অসহায় শালবনির কুড়িটি পরিবার। রবিবার।

জাতিভেদের লজ্জা - ৮মে ২০১৭ দৈনিক যুগশঙ্খের খবর

পশ্চিমবাংলায় যদি এই জাতিভেদ টিকে আছে তবে তা বাকি ভারতের মত হিন্দু মতেই টিকে আছে। অনেককাল আগে একবার এই বিষয়ে এক তর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলুম চতুর্বর্ণ বিভাজন ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার ব্যাপারে হিন্দু হিসেবে গর্বিতরা ঠিক কী ভাবছে! যদি সমস্ত বর্ণকে হিন্দুর দুর্দিনে কাছে পেতে হয় তবে কেন শঙ্করাচার্য ঘোষণা করেন না চতুর্বর্ণ ভেদ তুলে দেওয়া হল? কোন উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে গেছিলেন বিপক্ষের বন্ধু। এই প্রশ্ন আমার আজও। কোটি কোটি হিন্দু যারা প্রতিদিন জানে যে তারা ছোট জাত, তারা কেমন করে গর্বের সাথে বলবে তারা হিন্দু? সামাজিক ভেদ দূর না করে হিন্দু হিসেবে গর্ব বোধ করা এক ধরণের মুর্খামি। একজন ব্রাহ্মণ বলতেই পারেন তিনি হিন্দু হিসেবে গর্বিত। কারণ তিনি

জাত মেরেছে স্টেশনে

বর্ণশ্রেষ্ঠ, কারণ এই ব্যবস্থায় তিনিই সবচেয়ে বেশী উপকৃত। আমি বলতে পারি না। কারণ আমি এই ব্যবস্থার শিকার।

গ্রন্থপঞ্জী

জাতিভেদ- ক্ষিতিমোহনসেন, বিশ্বভারতী, ১৯৯৭
বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, দেজ, ১৪২০
বাঙলা ও বাঙালীরবিবর্তন- ডঃঅতুলসুর, সাহিত্যলোক, ২০১২
আমাদেরপদবীরইতিহাস- লোকেশ্বরবসু, আনন্দ, ২০০৯
সদগোপ কুলীন সংহিতা- শ্রী মোক্ষদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ১৩২০
পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ (৩য় খণ্ড)- জেমস ওয়াইজ, অনুবাদ-ফওজুল করিম, আই সি বি এস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২

কথাবার্তা আশিস অভিকুন্তক

আশিস অভিকুন্তক ফিল্ম মেকার, স্কুল থেকে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি পরে, গান্ধীবাদি, আমেরিকায় পড়তে যাবার সুযোগ পেয়ে সেখানে না গিয়ে চলে যায় নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে যোগ দিতে, মেধার ডাকে। এখন পড়ায় আমেরিকায়, ফিল্ম করে নিজের সঞ্চয়ের পয়সায়। তার ফিল্মগুলো যেন এক একটি প্রবন্ধ। রোজ ২ ঘন্টা চরকা কাটে বাড়িতে। এপ্রিল মাসে তার ফিল্ম 'কল্কিমন্থনকথা' দেখার পর,আশিসের জীবন – দর্শন ও সিনেমা নিয়ে কথা হল –সুরজিৎ সেন

যদ্দুর জানি তোমার নাম আশিস চাড্ডা,অভিকুন্তক কোথা থেকে এল?

সেটা লম্বা গল্প। তার আগে বলি,চাড্ডা এমনই একটা পদবী যেটা হিন্দু পাঞ্জাবি, মুসলমান পাঞ্জাবি আর শিখ পাঞ্জাবিদের মধ্যে আছে। আমরা মূলত পাঞ্জাবি ক্ষত্রিয়। আমাদের গোষ্ঠিটি হল খুখরেন গোষ্ঠি। এর হল যোদ্ধা। পাঞ্জাবে আনন্দ, খোলি, সবরিওয়াল,চাড্ডা – এরা সব যোদ্ধার জাত।

তোমরা তাহলে পাঞ্জাব থেকে এসেছ ?

আমাদের আদি নিবাস হল রাওয়ালপিণ্ডির কাছে একটা জায়গা। আমার প্রপিতামহ ১৯১০/১১ সালে মর্দান বলে একটা শহরে চলে যায় যেটা আফগানিস্তান বর্ডারের ১৫ / ২০ কিলোমিটার দূরে। খাইবার পাসের কাছে। ওই শহরটা এক নবাবের অধীনে ছিল। প্রপিতামহ ছিলেন পেশায় আয়ুর্বেদিক ও ইউনানি চিকিৎসক। নবাব ওকে জায়গা দিল প্র্যাকটিস করবার। ১৯৪৭ সালে উনি ওই অঞ্চলের সব চেয়ে ধনী ও নামকরা ডাক্তার। আবার অ্যালুমুনিয়ামের বাসন

তৈরির ফ্যাক্টরি করেছিলেন, একটা বড় দোকানও ছিল অ্যালুমুনিয়ামের বাসনের। আমার ঠাকুর্দারা অনেক ভাই বোন ছিলেন। ১৯৪৭ সালের মার্চে নবাব তাদের বলে যে এটা পাকিস্তান হয়ে যাবে। তোমারা চলে যাও, আমি বাঁচাতে পারব না। আমার ঠাকুর্দাদের একটা বিশ্বাস ছিল এই সব সাময়িক ব্যাপার, ছয় মাসের মধ্যে সব আবার আগের মতো হয়ে যাবে।

মর্দান থেকে তাঁরা ভারতের পাঞ্জাবে চলে এলেন?

না। ভারতের পাঞ্জাবে ওনারা যানইনি। সামান্য কিছু সঞ্চয় নিয়ে তাঁরা গেলেন জম্মু। প্রপিতামহের শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা ওখানে থাকতেন। ওখানে কিছুদিন থাকার পর সবাই বুঝল যে আর মর্দানে ফিরে যাওয়া যাবে না, ওটা এখন পাকিস্তান। তখন আমার ঠাকুর্দা দেরাদুনে চলে গেলেন। বাবা ওখানে বড় হচ্ছিল, তারপর সবাই উত্তরপ্রদেশের বারেলিতে চলে যায়।

মর্দানের বাড়ি – সম্পত্তি সবই হাতছাড়া হল?

সে তো হলই। ওই মর্দানের বাড়িটা চলে আসবার আগে প্রপিতামহ যাঁকে দিয়ে আসেন উনি ছিলেন খান আব্দুর গফফর খান অর্থাৎ সীমান্ত গান্ধীর যে পার্টি 'খুদাই খিদমতগার' এর স্থানীয় নেতা। সম্প্রতি আমার এক পাকিস্তানি বন্ধু,যে আমেরিকায় থাকে,দেশে গিয়েছিল। সেই সময় একবার মর্দানে গিয়ে আমাদের বাড়ির ছবি তুলে এনেছে। আমারও একবার ইচ্ছে আছে যাবার। যাই হোক, ঠাকুর্দা দেরাদুন থেকে বারেলিতে চলে যায়। ওখানে ওষুধের দোকান খোলে ও ডাক্তারি করে। ঠাকুর্দা আর্য সমাজে যোগ দেয়, সেই মর্দানে থাকতেই ।

দয়ানন্দ সরস্বতী যার প্রতিষ্ঠাতা ?

হ্যাঁ। পশ্চিম পাঞ্জাবে ১৯৩০ সাল নাগাদ আর্য সমাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হয়ে ওঠে। এই যত পাঞ্জাবি ক্ষত্রিয় আছে সব আর্য সমাজের সদস্য হয়ে যায়। তো ঠাকুর্দা বারেলিতে আর্য সমাজের একজন প্রধান নেতা হয়ে ওঠে। ঠাকুরদা বেশ কিছু মুসলমানকে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনে।

আর্য সমাজের ওটাই রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা ছিল যে মুসলমানরা যেমন ধর্মান্তরিত করে, আর্য সমাজও কাউন্টার ধর্মান্তরিত করবে ....

কিন্তু আর্য সমাজিরা কখনো হিন্দু মহাসভা বা আর এস এস – এর সঙ্গে যোগ দেয়নি।

তুমি নাকি এই ব্যাণ্ডেল লাইনের শ্রীরামপুরে ছিলে?

বাবা বিড়লা ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে ফার্মেসি নিয়ে পড়েছে। এম এ পাশ করে বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করে শেষে শ্রীরামপুর। কোন্ননগরে টাটা –ফাইজেন কোম্পানির ওষুধের ফ্যাক্টরি ছিল, বাবা ওখানের ফ্যাক্টরির ম্যানেজার ছিল আর মাকে নিয়ে শ্রীরামপুরে থাকত। ফাইজেন ছিল আমেরিকান কোম্পানি।

আচ্ছা তোমার বাবা তখন বিবাহিত ?

হ্যাঁ। আমার মায়ের বাবারা ছিলেন লাহোরের লোক। ওনারাও উদ্বাস্তু। তো আমার বাবা আর মা দুজনেই ছিন্নমূল পরিবারের মানুষ। আর মায়ের ঠাকুর্দা লাহোরের কুস্তিগির ছিলেন আর ডাক্তারি পড়তেন। মায়ের বাবারও একটা ওষুধের দোকান ছিল। লাহোরে ঘটনাটা হয়েছিল কি ওখানে হিন্দুরা ছিল সংখ্যালঘু, কিন্তু ধনী। হিন্দুরা চেয়েছিল লাহোর ভারতেই থাকবে। জুনের শুরুর দিকে তারাই দাঙ্গায় ইন্ধন দেয়। ১৩ অগস্ট ১৯৪৭,যখন জানা গেল যে লাহোর পাকিস্তানে যাবে, তখন হিন্দুরা পালাতে শুরু করে এবং মুসলমানরা পাল্টা মার দিতে থাকে। আমার মায়ের পরিবার ১৮ অগস্ট ট্রেনে চেপে ভারতে আসে। এসে দিল্লিতে পুরানা কিলায় উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়।পরে কমলানগরে উদ্বাস্তুদের জন্য নেহেরু আবাসন তৈরি করেন। সেখানে এই পরিবার একটি বাড়ি পায়। মায়ের বাবাও যা কিছু সামান্য সঞ্চয় দিয়ে দিল্লির চাঁদনী চকে একটা ওষুধের পাইকরি বিক্রির দোকান দেয়। বারেলি থেকে আমার বাবার বাবা ওই দোকানে ওষুধ কিনতে আসত। ওইভাবেই বাবা – মায়ের বিয়ের ব্যাপারটা ঘটে।

শ্রীরামপুরে কী হল ?

আমার মা যখন প্রেগন্যান্ট তখন আমার বাবা তাকে জম্মুতে আমার জেঠার কাছে পাঠিয়ে দেয়। কারণ জেঠা আর জেঠিমা সেখানে আর্মি হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। আমি ওখানেই জন্মাই। এরপর মা ফিরে আসে শ্রীরামপুরে। ওই রকম একটা মফস্বলে মা থাকতে চায় না, ১৯৭১ সাল ঘোর নকশাল আমল, মা সারাদিন একা থাকে, বাবা গভীর রাতে ফেরে। চারপাশে বাঙালি, মা একমাত্র পাঞ্জাবি, কোনো বন্ধু নেই। খুন, বোমা, পুলিশি তল্লাশি চারপাশে চলছে। এদিকে বাবাকে নকশালরা থ্রেট করেছে যে লেভি দিতে হবে। সব মিলিয়ে ওনারা বছর দুয়েক ছিলেন ওখানে। তারপর কলকাতায় সাদার্ন অ্যাভিনিউতে চলে যান।

বাবা চাকরি ছেড়ে দিলেন ?

হ্যাঁ। ডেক্সোরেঞ্জ নামে একটি ওষুধের ফ্যাক্টরির ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। ফ্যাক্টরি ছিল তিলজলায়।

ডেক্সোরেঞ্জ ওষুধ হিসেবে খুব জনপ্রিয় ছিল। আমাদের বাড়িতেও দেখেছি। শখের থিয়েটারে রক্ত দেখাতে লাল ডেক্সোরেঞ্জ ব্যবহার হতো

ডেক্সোরেঞ্জ তো রক্ত দিয়েই তৈরি। আয়রন টনিক। পশুর রক্ত দিয়ে তৈরি। বোধহয় বেলেঘাটায়,স্টেট স্লটার হাউসে জবাই করা পশুর লিটার লিটার রক্ত ফ্যাক্টরিতে আসত। সেখানে ওরা পশুর ব্লাড থেকে হিমোগ্লোবিনটা আলাদা করে নিত এবং তার সঙ্গে অরেঞ্জ ফ্লেভার দিয়ে টনিকটা তৈরি হত।

তোমার স্কুল কোথায় হল ?

আর কোথায় ডন বসকো (পার্ক সার্কাস)। অদ্ভুত স্কুল,বাংলা আর হিন্দি ওখানে নিষিদ্ধ। শুধু ইংরেজি চলবে। একদম পোস্ট কলোনিয়াল মডার্ন প্রজা তৈরির কারখানা। বাংলা ভাষাটা আমার আর শেখা হলো না। বলতে পারি কিন্তু পড়তে পারি না। হিন্দিটা অবশ্য দুটোই পারি,তবে বেশ খারাপ। ততদিনে ইংরেজি আন্তর্জাতিক বাজারের ভাষা হয়ে গেছে। পরে এটা এখন ডিজিটাল জগতের ভাষাও হয়ে গেছে। যাই হোক, ওই বাজে স্কুলটাতে পড়তে হল। এমন কুশিক্ষা দিয়েছিল যে এখনো আমাকে সেটা ভুলে যাবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়।

ওখানেই ১০ বছর পড়লে ?

না। ক্লাস নাইনে ডন বসকো ছেড়ে দিলাম। এর মাঝে হলো কী, জেসুইট খ্রিস্টানরা পূর্ব ভারতে লিডারশিপ প্রোগ্রাম অফ স্টুডেন্ট সার্ভিস(এল টি এস) বলে একটা প্রোজেক্ট চালায়। ১৯৫৯ সালে এটা চালু হয়। এটা মূলত মধ্যবিত্ত ছাত্রদের সোশ্যাল সার্ভিস শেখানোর নেটওয়ার্ক। এই সংগঠনটা জেসুইটদের ছদ্মবেশে মার্কসবাদীরা চালাত। সব মিশনারি স্কুলেই এদের নেটওয়ার্ক ছিল। আমি এখানে যোগ দিলাম ক্লাস নাইনে। একটা মুক্ত শিক্ষার পরিবেশ। বাইবেল, কোরান, গীতা সব পড়তে হল। গ্রামে কাজ করতে যাচ্ছি, মাদার টেরিজার আশ্রমে কাজ করছি, সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের কোর্সের বাইরে পড়াশোনা হচ্ছে। ঢাকুরিয়াতে তখন একটা এন জি ও ছিল নাম সার্ভিস সেন্টার, এখনো আছে। ওখানে ছিলেন অর্ধেন্দুদা। উনি সত্তরের দশকে অস্ট্রেলিয়া যান। সেখানে উনি সাসটেনেবল এগরিকালচার, অর্গানিক ফারমিং ইত্যাদি শিখে এসে এখানে কাজ শুরু করেন। অর্ধেন্দুদার বোধহয় একটা নকশাল অতীতও আছে। ভারতে পরিবেশ নিয়ে যে সব এন জি ও প্রথম কাজ শুরু করে সার্ভিস সেন্টার তাদের মধ্যে অন্যতম। এখন ওদের সংগঠন বিরাট হয়ে গেছে। আমি এল টি এস প্রোগ্রামের মাধ্যমে এদের সঙ্গে যুক্ত হলাম। এরা তখন
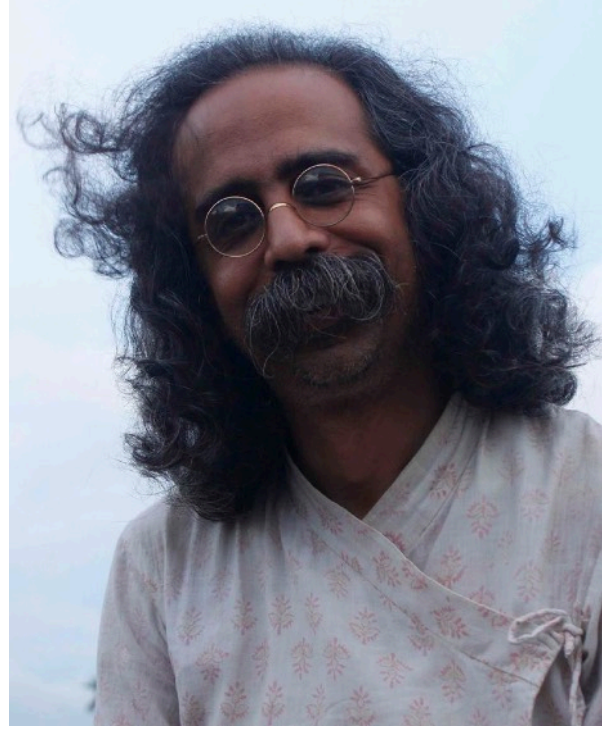
আমার মায়ের বাবারা ছিলেন লাহোরের লোক। ওনারাও উদ্বাস্তু। তো আমার বাবা আর মা দুজনেই ছিন্নমূল পরিবারের মানুষ। আর মায়ের ঠাকুর্দা লাহোরের কুস্তিগির ছিলেন আর ডাক্তারি পড়তেন। মায়ের বাবারও একটা ওষুধের দোকান ছিল। লাহোরে ঘটনাটা হয়েছিল কি ওখানে হিন্দুরা ছিল সংখ্যালঘু, কিন্তু ধনী। হিন্দুরা চেয়েছিল লাহোর ভারতেই থাকবে। জুনের শুরুর দিকে তারাই দাঙ্গায়

সুন্দরবন অঞ্চলে মৎস্যজীবীদের নিয়ে কাজ করছিল। ওদিকে টমাস কোচারি বলে একজন লিবারেশন থিওলজিস্ট,কেরালার জেসুইট প্রিস্ট, ১৯৮৬ সালে উনি 'সেভ দ্য ওয়েস্টার্ন ঘাট' আন্দোলন শুরু করছেন, এর আগে ১৯৮৩ সালে সুন্দরলাল বহুগুণা চিপকো আন্দোলন শুরু করেছেন। টমাস কোচারি ন্যাশনাল ফিশ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন তৈরি করেন। যাদের শাখা ছিল সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা। চারপাশে এইসব চলছে আর আমি সুন্দরবনে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে কাজ করছি, সব মিলিয়ে আমার সমাজ চেতনাটা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। আমি ডন বসকো ছেড়ে হাজরার কাছে ন্যাশনাল হাইস্কুল বলে একটা খারাপ স্কুলে ভর্তি হলাম।

সোশ্যাল ওয়ার্কে জড়িয়ে পড়লে ?

হ্যাঁ, তখন নকশালবাড়ির ইতিহাস পড়ছি। সেই সময় ইভান ইলিচের লেখা একটি বই 'ডিস্কুলিং সোসাইটি' পড়ি। কেউ বলেনি পড়তে,এমনিই লাইব্রেরি থেকে এনেছিলাম। সেখানে উনি বলছেন যদি তুমি তথাকথিত ভালো স্কুলের বাইরে সত্যি কিছু শিখতে চাও, তাহলে খারাপ স্কুলে ভর্তি হও। তাই ন্যাশনাল হাইস্কুলে গেলাম। সকাল ৬ -০০ থেকে ১১ -০০ পর্যন্ত স্কুল চলে,আমি ৯ -০০ টায় স্কুল থেকে বেরিয়ে যাই। কেউ কিছু বলে না। ইলেভেন – টুয়েলভ – এ পড়ার সময় সপ্তাহে ৩ দিন মাদার টেরিজার আশ্রমে কাজ করছি বা সুন্দরবন চলে যাচ্ছি। মাদার টেরিজার ওখানে আমার ১৬ বছর বয়সে আমার কোলেই মানুষ মারা গেছে এরকম অভিজ্ঞতাও হয়েছে।

তোমার সঙ্গে নাকি মেধা পাটেকরের দেখা হয়েছিল ?

হ্যাঁ। ১৯৯০ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার হরিপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করবে ভারত সরকার তার বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছিল। সেখানে মেধা এসেছিলেন। তখন মেধার সঙ্গে আলাপ হয়, আমার তখন ১৮ বছর আর মেধার তখন ৩০ বছর বয়স। ওনার কথা আর ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছিল

হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে কী করলে ?

আর হায়ার সেকেণ্ডারি,একদম পড়াশোনা করিনি। তাই টুকে পরীক্ষা দিয়েছি। টুকতে গিয়ে ধরা পড়েছি, কোনোরকমে ছাড়া পেয়েছি। শেষ পর্যন্ত ৩৯% পেয়ে পাশ করলাম।

বেশ তারপর কী করলে ?

সেই সময় আমার তিন ধরনের বন্ধু, এরা সব ডন বসকোর, ন্যাশনালে কোনো বন্ধু হয়নি। এক দল আই টি সেক্টরে ঢুকবে বলে তৈরি হচ্ছে, আরেকদল আমেরিকায় যাবে বলে তৈরি হচ্ছে, আরেক দল যারা বড়লোকের ছেলে তারা বি কম পড়বে আর বাবার ব্যবসা দেখবে। আমিও পরীক্ষা দিয়েছিলাম আমেরিকায় যাবার জন্য। শিকাগোর কাছে ভিসকন্সিতে একটি কলেজে সুযোগ পেয়েছিলাম ভর্তি হবার, স্কলারশিপও পেয়েছি। ওটা ছিল পরিবেশবিদ্যা নিয়ে পড়বার কলেজ। আমার ভিসার অ্যাপ্লিকেশনও হয়ে গেছে। এমন সময় কলকাতায় মেধা পাটেকরের সঙ্গে আবার দেখা। আশ্চর্য আমার নামও মনে রেখেছেন! উনি বললেন, 'কী করছো আশিস' ? আমি বললাম 'আমেরিকাতে পরিবেশবিদ্যা পড়তে যাব'। উনি বললেন, 'আমার ওখানে এস। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের জন্য কাজ কর'।

সত্যিই যদি মেধা সেটা করতো তাহলে সেটা ভারতের ইতিহাসে একটা অধ্যায় হয়ে থাকত। ড্যামটা তৈরি হত না। এই সময় আপ নেতা সিনিয়র প্রশান্তভূষণ মেধাকে বলে সুপ্রিম করতে আপিল করতে। মেধা রাজি হলেন। এই ব্যাপারটায় আমি খুব হতাশ হলাম। সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া মানে রাষ্ট্রের শর্তগুলো মেনে নেওয়া। সংগঠনেও ভাঙন ধরল। আনন্দ পটবর্ধন ও আরো কেউ কেউ বলল যে হ্যাঁ সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া উচিত।

তুমি আমেরিকা না গিয়ে মহারাষ্ট্র চলে গেলে ?

হ্যাঁ। বাড়িতে বাবাকে বললাম। বাবা বলল যে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া চলবে না। পড়াশোনা করে যা খুশি কর। তখন একজন আমাকে বলল বম্বেতে একটি কলেজ আছে যারা সোশ্যাল ওয়ার্কে ব্যাচেলর ডিগ্রি দেয় ওখানে যাও। এটা হল বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক। এই কলেজ থেকে অনেক ছাত্রকে মেধার আন্দোলনে ফিল্ড ওয়ার্ক করতে পাঠানো হত। ওখানে গিয়ে বললাম মেধা বলেছে ওর কাজে যোগ দিতে আর তার সঙ্গে আমি এই বিষয়টা পড়তে চাই। ব্যাস, ভর্তি হয়ে গেলাম, পরীক্ষাও দিতে হল না । বাবা খুশি কিন্তু মা ভেঙে পড়েছে। ছেলে আমেরিকায় না গিয়ে কী সব করছে।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে যোগ দিলে ?

হ্যাঁ। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২ টো অবধি কলেজ, তারপর বাকি সময়টা নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের কাজ। ৩ বছর আমি নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের হোলটাইমার হয়ে কাজ করেছি। ওদের বম্বের অফিসে বসতাম। এই সঙ্গে ওখানকার নকশালদের সঙ্গেও আলাপ হল। বম্বের একটি স্লামে এদের স্টাডি সার্কেলে যেতাম। থাকতাম ওয়াই এম সি এ হস্টেলে, সাউথ বম্বেতে।

বম্বেতে সিনেমা দেখতে না ?

হ্যাঁ। কলকাতায় থাকতে নন্দনে সিনেমা দেখার একটা অভ্যাস ছিল। ওই সোশ্যাল ওয়ার্ক করছি আর সিনেমা দেখছি, পড়াশোনা একদম করছি না। ১৯৯০ তে কলকাতায় ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে কিসলস্কির রেট্রোসপেকটিভ দেখি। সাড়ে ১৭ বছর বয়সে কিসলস্কি দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। মানে আমার প্রবল জ্বর এসে গেল।

বম্বেতে কয়েকজন ফিল্ম সোসাইটি অ্যাক্টিভিস্ট এর সঙ্গে আলাপ হল। একটা ফিল্ম ক্লাব ছিল স্ক্রিন ইউনিট বলে। অমৃত গাঙগার আর আশিস রাজাধক্ষ্য এটির প্রতিষ্ঠাতা। এরা মণি কাউল আর কুমার সাহানির ঘনিষ্ঠ ছিল। ওখানে ওঁদের সঙ্গে দেখা হত মাঝে মাঝে। ওই সময় গোদার থেকে তারকভস্কি সবই দেখছি। একটা স্বপ্ন জন্ম নিচ্ছে যে ফিল্ম তৈরি করতে হবে।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের কী হল ?

মেধা ওই সময় মহারাষ্ট্র তথা ভারতে একটা আইকনিক ফিগার। আমি ওদের প্রেস নোট লিখতাম। যেটা পরের দিন খবরের কাগজে ছাপা হবে। এছাড়া ওই আন্দোলন করতে গিয়ে মাঝেই মাঝেই মিছিল কী ধর্ণায় বসে গ্রেপ্তার হচ্ছি আর জামিনে ছাড়া পাচ্ছি। এই সময় বম্বেতে যারা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলন করছিল আমি তাদের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়ি। তখন আমার পিছনে আই বির লোক লেগেছিল। কলেজ আর হস্টেলে আমার সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাকে বলছে তুমি কী এমন কাজ কর যে পুলিশ এসে তোমার কথা জিজ্ঞেস করে।

সোশ্যাল ওয়ার্কে ডিগ্রি নিয়ে কী করলে ?

ডিগ্রিটা নিয়ে বুঝলাম এটা কোনো কাজেই লাগবে না। জিনিসটা ইন্টেলেকচুয়ালি ডিফাংড। সিদ্ধান্ত নিলাম আর যাই করি না কেন এই সোশ্যাল ওয়ার্কে মাস্টার ডিগ্রি করব না। এই সময়ে রাজনীতির ব্যাপারে আমার মোহভঙ্গ ঘটল। এখনো আমি মনে করি নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন সত্যিই একটা খাঁটি পরিবেশবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন যেটা ভারত সরকারকে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল। ওই সময় মেধা বেশ কয়েকবার জলসমর্পণ এর ডাক দিয়েছিল। মানে ড্যামে জল ছাড়লে ওখানেই বসে মৃত্যুবরণ করব। মেধা যতবার জল সমর্পণ এর ডাক দিয়েছে আমি ততবার সেখানে সামিল হয়েছি, সরকার শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছে। মেধা ছিল মূল চালিকা শক্তি। শঙ্কর গুহ নিয়োগী থেকে বিনোদ মিশ্র,গান্ধী সেবাগ্রামের কর্মী থেকে বম্বের বুদ্ধিজীবী সবাইকে একটা মঞ্চে সামিল করেছিল। এই রকম পরস্পর বিপরীত রাজনৈতিক শক্তি একটা মঞ্চে এসেছে, ভারতের ইতিহাসে এরকম হয়নি। ১৯৯৪ সালে মেধা আমরণ অনশনে বসবে বলে ঠিক করে, যতক্ষণ না ভারত সরকার ড্যামের কাজ বন্ধ করছে। সত্যিই যদি মেধা সেটা করতো তাহলে সেটা ভারতের ইতিহাসে একটা অধ্যায় হয়ে থাকত। ড্যামটা তৈরি হত না। এই সময় আপ নেতা সিনিয়র প্রশান্তভূষণ মেধাকে বলে সুপ্রিম করতে আপিল করতে। মেধা রাজি হলেন। এই ব্যাপারটায় আমি খুব হতাশ হলাম। সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া মানে রাষ্ট্রের শর্তগুলো মেনে নেওয়া। সংগঠনেও ভাঙন ধরল। আনন্দ পটবর্ধন ও আরো কেউ কেউ বলল যে হ্যাঁ সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া উচিত। অনেকে বলছে যে না সুপ্রিম কোর্টে যাব না। আমি এই সময় নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন থেকে বেরিয়ে এলাম।

বেরিয়ে এসে কোথায় গেলে ?

তখন ভাবছি সিনেমা তৈরি করব। তাহলে পুণেতে এফ টি আই আইতে যাই। গিয়ে দেখলাম সেই বছর অ্যাডমিশন বন্ধ, কী সব স্ট্রাইক চলছে ছাত্রদের। বম্বের একজন বলেছিল এফটি আই আইতে রোজ সন্ধেবেলা ফিল্ম দেখায়। তুমি ওখানে গিয়ে ফিল্ম দেখ। কেউ কিছু বলবে না। আমি তখন পুণে

ইউনিভার্সিটিতে অ্যানথ্রপলজিতে এম এ তে ভর্তি হতে গেলাম। ওখানে এক অধ্যাপক আমাকে বলেন যে এখানে অ্যানথ্রপলজি ডিপার্টমেন্ট ভাল নয় তুমি ডেকান কলেজে আর্কিওলজিতে ভর্তি হও, ওটা এখানে

খুব ভালো পড়ানো হয়।আমার বন্ধু পড়ায় আমি তোমার কথা বলব। আমি বললাম যে, আর্কিওলজি পড়তে অসুবিধে হবে। উনি বললেন যে, হবে না। দুটো বিষয়ের তফাত হল অ্যানথ্রপলজি জীবিত মানুষ নিয়ে কাজ করে এবং আর্কিওলজি মৃত মানুষ নিয়ে কাজ করে, এ নিয়ে তোমার অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। এর উত্তরে আমি কিছুই বলতে পারলাম না।

সোশ্যাল ওয়ার্ক থেকে অ্যানথ্রোপলজি থেকে আর্কিওলজি!

হ্যাঁ। পুণের ডেকান কলেজে, যেটা তখন ডিমড ইউনিভার্সিটি, দুটো ডিপার্টমেন্ট লিঙ্গুইস্টিকস আর আর্কিও লজি। দুটোরই খুব ভাল ফ্যাকাল্টি। ওখানে আর্কিওলজিতে ভর্তি হলাম। মাত্র ১২ জন স্টুডেন্ট। অধ্যাপকরা অসাধারণ, অনেকেই বিদেশ থেকে পড়ে এসেছেন। ডেকান কলেজ শহরের একদিকে আর এফ টি আই আই শহরের অন্যদিকে ১০ কিলোমিটার দূরে । সকালে কলেজে পড়ি আর সন্ধেবেলা এফ টি আই আই তে সিনেমা দেখি, ওদের ক্যান্টিনে রাতের খাবার খেয়ে হস্টেলে ফিরতাম। একটা সাইকেল কিনে রোজ ২০ কিলোমিটার আপ ডাউন করি। দুবছর এটা চলল। সারা পৃথিবীর সিনেমার সঙ্গে পরিচয় হল। এফ টি আই আই তে বেশ কিছু বন্ধুও হল। ক্যামেরাম্যান শীর্ষ আর সেতু এদেরমধ্যে ছিল। শীর্ষ তো কলকাতায় কাজ করে। সেতু সম্প্রতি 'দঙ্গল' এর ক্যামেরা করেছে।

এবার ঠিক করলে ফিল্ম করতে হবে ?

হ্যাঁ। আমি তখন ঠিক করেছি যে ফিল্ম করব। ১৯৯৫ সালে আমি প্রথম ফিল্ম করি। একজন মানুষ নগ্ন হয়ে ধূ ধূ প্রান্তরের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। পুণেতে আর্মির একটা ট্যাঙ্ক টেস্টিং রেঞ্জ ছিল । বিরাট ফাঁকা প্রান্তর। যে দিন টেস্টিং হয় না, ওরকম দিন দেখে আমরা শ্যুট করলাম। গাড়ি নিয়ে সোজা অনেকটা ভেতরে গিয়ে শ্যুট করেছিলাম। আমার একজন ডান্সার বন্ধু অভিনয় করেছিল। ১৬ মিলিমিটার ফিল্মে শ্যুট করেছিলাম, শঙ্কর রমন বলে একজন ক্যামেরা করেছিল। এইভাবে শুরু হল ফিল্ম তৈরি।

শুরুতে যে প্রশ্নটা করেছিলাম যে অভিকুন্তক কোথা থেকে এল ?

১৯৯২ সালে সিনেমা দেখছি, রাজনৈতিক কাজ করছি, কিন্তু বাজে কবিতাও তো লিখতে হবে। আর প্রেমও করতে হবে। ইংরেজিতে কবিতা লিখতাম, সেগুলো খুব খারাপ। তখন আমি ভাবলাম আশিস চাড্ডার পক্ষে কবিতা লেখা সম্ভব নয়। তাই অভিকুন্তক পদবীটা নিলাম। তখন আমি 'অভিকুন্তক' শব্দটির অর্থও জানতাম না। শব্দটা মনে এল, ভাল লাগল, ব্যবহার করতে শুরু করলাম। বছর দশেক পর এক সংস্কৃতর অধ্যাপিকার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় তিনি আমাকে বলেন, যে, এর অর্থ হল 'যে কাউকে আঘাত করে না'।

প্রথম ফিল্মটা শেষ করে কী করলে ?

এম এ ডিগ্রীটা শেষ করলাম। টাকা নেই ফিল্ম বানাবার। তখন একটা ১৬ মিলিমিটার ফিল্মের ক্যান কিনে একটা শর্টে একটা ফিল্ম করলাম, কোনো রকম এডিট ছাড়াই। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে ৭ টা ১৬ মিলিমিটারের ক্যান কিনে ৭ টা শর্ট ফিল্ম করেছি। ৭ টা ফিল্মই ১১ মিনিটের এবং একটাই শর্ট নেওয়া হয়েছে সব ফিল্মে। এর মধ্যে ৪তে ফিল্মকে নাম দিলাম 'এটসেটরা'। প্রথম 'সলিলকি',একজন নগ্ন হয়ে হেঁটে যাচ্ছে। দ্বিতীয়টি ছিল একজন ছেলের মাথা কামানো হচ্ছে। তৃতীয়টি হল, হাওড়া ব্রিজের নীচে একজন রিক্সাওয়ালা রিক্সাটা পারে রেখে গঙ্গায় ডুব দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। চতুর্থটি ছিল পার্ক স্ট্রিট কবরখানায় একজন হেঁটে বেড়াচ্ছে। বাকি তিনটে ফিল্ম আমার অন্য ফিল্মে ব্যবহার করেছি। একটি হল আমার এক বন্ধুর বাড়ি কালীপুজোয় পাঁঠা বলির অনুষ্ঠান। কিন্তু তিন মিনিট শ্যুট করার পর ভাল লাগেনি, বন্ধ করে দিয়েছি। আরেকটি হল বম্বের ফ্যাশন স্ট্রিট। পুরো রাস্তাটা শ্যুট করা হল।

বম্বেতে এসে ফিল্মের কাজ করতে শুরু করলে ?

পুনে থেকে বম্বেতে ফিরে এসে ধারাবির বস্তিতে একটি ঘর নিয়ে থাকতে শুরু করি। সাড়ে তিন বছর ধারাবিতে থেকেছি। বিজ্ঞাপনের ছবির কাজ করব বলে কয়েকটা কোম্পানিতে গেলাম, বুঝলাম আমার দ্বারা হবে না। হঠাৎ আমি একটা প্রোজেক্ট পেলাম মহারাষ্ট্রের আদিবাসীদের লোককথা আর মুখের কথার ইতিহাস ডকুমেন্ট করার। আমার এক বন্ধু কাজ দিয়েছিল। আমি টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করতাম ওদের কথা আর গল্প। দেড় বছর এই প্রোজেক্ট চলল। এরপর আমি একজন পার্সি ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকারের কাছে কাজ চাইতে গেলাম। উনি বললেন যে তুমি আর্কিওলজি পড়েছ, ধুতি – পাঞ্জাবি পরে থাকো সব সময়। তুমি বাস্তু কনসালটেন্ট এর কাজ কর। বাস্তু বিশেষজ্ঞর কাজ করতে লাগলাম। যেহেতু আমি আর্কিওলজি পড়েছি, তাই আর্কিটেকচার আর এথনোলজির বিষয়ে জানা ছিল। ওনার কাছে ছয় মাস

অ্যাসিসটেন্ট হয়ে কাজ করে, তারপর নিজেই কাজ শুরু করলাম। ওই পার্সি ভদ্রলোক আমার কাছে ক্লায়েন্ট পাঠাতেন। ওই সময় বম্বেতে বাস্তু ইজ আ বিগ থিং। প্রচুর বিল্ডিং হচ্ছে। ৩ বছর এই কাজ করেছিলাম। ফ্ল্যাট আর বাড়ি নিয়ে প্রায় ৮০ টা কাজ করেছি। যে টাকা রোজগার করলাম, তাতে ফিল্ম তৈরির টাকা এসে গেল। আর সেই সময় রাজনীতি বলতে এনরন (যারা পারমাণবিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করছিল) বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম।

বিদেশে কবে গেলে ?

সেটাও লম্বা গল্প। বম্বেতে আলাপ হল অশ্বিনীর সঙ্গে (আমার প্রাক্তন স্ত্রী)। অশ্বিনী দেও। মারাঠি ব্রাহ্মণ। আলাপ হল এবং প্রেমও হল। ও পড়াশোনায় খুব ভাল। আমি ৩৯ % আর ও হল ৯৩%। মানে স্কুল থেকেই ওরকম নম্বর পেয়ে আসছে এম এ পর্যন্ত। অশ্বিনী সোশ্যাল ওয়ার্কে বি এ করে খুব হতাশ। ওকে তখন বললাম ডেকান কলেজে লিঙ্গুইস্টিকস নিয়ে এম এ করতে। ও গেল পুণেতে আর আমি বম্বেতে, তবে নিয়মিত যাতায়াত করতাম। ও লিঙ্গুইস্টিকস আর সংস্কৃত (পাণিনির ব্যাকরণে) দুটোতেই এম এ করল, গোল্ড মেডেল পেল। তারপর পি এইচডি করল। আর ডেকান কলেজেই সংস্কৃত অভিধান লেখার একটা প্রোজেক্টে যোগ দিল। সেখানে কিছুদিন কাজ করবার পর অশ্বিনী সংস্কৃত নিয়ে গবেষণা স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ পেল। আমরা বিয়ে করে নিলাম। ওর তখন ২২ আর আমার ২৬ বছর বয়স। আমি ধারাবির বস্তি ছেড়ে চলে গেলাম আমেরিকা।

অশ্বিনী তো গবেষণা করল তুমি কী করলে ?

আমেরিকা যাবার আগে আমি সবে শেষ করেছি আমার আরেকটি ফিল্ম ‘কালিঘাট অতিকথা’। আমেরিকাতে আমি গেলাম মূলত হাউস হাজব্যান্ড হিসেবে। রান্না করা ঘর গৃহস্থলী দেখা আমার কাজ। তবে আমেরিকাতে একটা মিরাকল হল। ডেকান কলেজে আর্কিওলজির যে প্রফেসর ছিল, উনি ই এন হডার এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আর হডার আর্কিওলজির জগতে একজন পৃথিবী বিখ্যাত তাত্ত্বিক। হডারকে আর্কিওলজির ফুকো বলা হয়। আমি যে বছর অশ্বিনীর সঙ্গে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ঢুকছি সেই বছরই হডারও ওখানে যোগ দিচ্ছেন, ২২ বছর কেমব্রিজে পড়ানোর পর। আমি শুনে অবাক। আমার ডেকান কলেজের প্রফেসর হডারকে একটা চিঠি লিখে দিলেন। আমি গিয়ে দেখা করলাম। উনি বললেন,তুমি পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই কর। আমি অ্যাপ্লাই করলাম এবং চান্স পেয়ে গেলাম স্ট্যানফোর্ডে। এটা আমার জীবনে একটা মিরাকল। ৬ বছরের জন্য বছরে ১৩ হাজার ডলারের স্কলারশিপ আমি ভাবতে পারিনি। আমি খুশি যে টাকা বাঁচিয়ে ফিল্ম করতে পারব।

পিএইচডি করে কী করলে ?

পিএইচডি করলাম আর আমার প্রথম ফিচার ফিল্ম ‘নিরাকার ছায়া’ শেষ করলাম। এই ফিল্মটা ৩৫ মিলিমিটারে করেছিলাম। ওদিকে পিএইচডি করলাম এথনোগ্রাফি অফ আর্কিওলজি। দু’বছর কাজ করলাম রাজস্থান, গুজরাত আর হরিয়ানাতে কাজ করলাম। এরপর অশ্বিনী ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে চাকরি পায়, আমিও ওখানে চলে যাই। ততদিনে মেয়ে হয়েছে আমাদের।

ইয়েলে তুমি কি আবার হাউস হ্যাজব্যান্ড ?

না, এবারেও লাক। ওখানে আমি লেকচারারশিপ পেলাম। ইন্ডিয়ান সিনেমা, ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি আর ইন্ডিয়ান অ্যানথ্রোপলজি পড়াতাম। যদিও হডারের আন্ডারে পি এইচ ডি করেছি বলে অনেকে পছন্দ করত না। কারণ হডারকে বেশির ভাগ আমেরিকান তাত্ত্বিকরা পছন্দ করত না। আমি হডারের দ্বিতীয় ছাত্র আমেরিকায়। আমি তিন ধরনের ইন্ডিয়ান সিনেমা পড়াতাম, বলিউড, ডকুমেণ্টারি আর আর্ট ফিল্ম। আমার পড়ানোর কোনও ট্রেনিং ছিল না। শুধু ফিল্মের প্রতি ভালোবাসা থেকে পড়িয়েছি। ৩ বছর পড়ানোর পরও চাকরি পাচ্ছি না। কারণ হডারের ছাত্র । তখন একজন আমাকে বলল, তুমি ফিল্ম স্টাডিজে পড়ানোর চাকরি খোঁজ। একটা অদ্ভুত চাকরি পেলাম বোস্টনের কাছে রোড আইল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে। ওরা এমন একজনকে খুঁজছিল যে ফিল্ম করেছে এবং পড়াতেও পারবে। ১৭৫ জন এই চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল, আমি পেয়ে গেলাম, লটারির মতো ব্যাপার। পরে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে

কল্কিমন্থনকথা

আমাকে নেওয়া হল কেন ? ওরা বলল আর কারোর ফিচার ফিল্ম করার অভিজ্ঞতা ছিল না, তোমার একটা ফিচার ফিল্ম আছে তাই নেওয়া হল। এছাড়া তুমি স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পি এইচ ডি করেছ।

তুমি বাঙালি নও,অথচ তোমার পোশাক বাঙালির ধুতি –পাঞ্জাবি। এই ব্যাপারটা কী?

ডন বসকোতে পড়তে গিয়ে বুঝলাম এমনভাবে আমাকে তৈরি করা হচ্ছে যাতে আমার মনে দেশীয় ঐতিহ্য আর দেশীয় ভাষা সম্পর্কে একটা ঘৃণা জন্মায়। তখন আমার মনে হয় এটার বিরোধিতা করা দরকার। কিন্তু কী ভাবে? যখন সার্ভিস সেন্টারে কাজ করতাম দেখলাম ওদের কাজের ফ্রেম ওয়ার্কটা

অনেক যুক্তির লড়াই করে ধুতি পাঞ্জাবিতে টিকে থাকলাম। এটাই আমার পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট। এবং এই আধুনিকতা আমাদের কী ক্ষতি করতে পারে সেটা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী বুঝতে পেরেছিলেন। এই হল ধুতি পাঞ্জাবি পড়ার রাজনীতি।

গান্ধীর দেখানো পথ ধরে চলার চেষ্টা করে। এই সময় আমি গান্ধীর 'হিন্দ স্বরাজ' বইটা পড়ি। গান্ধীর দর্শন উপলব্ধি করে ১৬ বছর বয়স থেকে ধুতি পাঞ্জাবি পরা অভ্যাস করতে শুরু করলাম। মা প্রচণ্ড বিরোধিতা করতে শুরু করল। অনেক যুক্তির লড়াই করে ধুতি পাঞ্জাবিতে টিকে থাকলাম। এটাই আমার পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট। এবং এই আধুনিকতা আমাদের কী ক্ষতি করতে পারে সেটা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী বুঝতে পেরেছিলেন। এই হল ধুতি পাঞ্জাবি পড়ার রাজনীতি।

আবার তুমি বাংলা বলতে পার কিন্তু পড়তে পার না। কিন্তু তোমার ফিল্মের ভাষা বাংলা। এটাই বা কেন?

আমি বাংলা পড়তে পারি খুব কষ্ট করে। অনেক সময় লাগে। ফিল্মের ভাষা বাংলা ...... দেখ,আমি নিজেকে বহুভাষী মানুষ হিসেবে দেখি। আমার মাতৃভাষা পাঞ্জাবি, কিন্তু সেটা আমার বাবা মা আমকে শেখায়নি। কলকাতায় বড় হয়েছি, তাই বাংলা কিছুটা জানতেই হয়েছে। বেশির ভাগ বন্ধুরা বাঙালি। আমিও তো সেই অর্থে ছিন্নমূল। কলকাতায় একজন আউটসাইডার হিসেবেই বড় হয়েছি। আমেরিকায়, পাঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে সর্বত্র আমি আউটসাইডার। কিন্তু আমাকে কোথাও একটা শিকড় ছড়াতে হবে,সেটা হল কলকাতা। সত্যজিত রায় বা ঋত্বিক ঘটকের ছবি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। আমার ভালোবাসার ভাষা বাংলা আর বুদ্ধিবৃত্তির ভাষা ইংরেজি। তাই আমার ভালোবাসার আর্ট ফর্মের ভাষাও বাংলা। আমার ফিল্ম ইউনিটের যারা আছে আমার অভিনেতারা সবাই বাঙালি। আশা করি বোঝানো গেছে।

তোমার ঘরে একটি চরকা আছে। চরকা কী

কাজে লাগে ?

এটা লম্বা কাহিনি, ছোটো করে বলছি। যখন মেধা পাটেকরের সঙ্গে কাজ করছি তখন পরিবেশ সচেতনতা দিয়ে সব কিছু বুঝতে চেষ্টা করছি। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ছিল মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত। আর আশ্চর্য, আমি দেখেছি, একই মিটিঙে শঙ্কর গুহ নিয়োগী, বিনোদ মিশ্র আর গান্ধী সেবাশ্রমের প্রতিনিধিও আছে। গান্ধীবাদের প্রতি আমার ঝোঁক ছোটো থেকে। ক্লাস নাইন থেকে আমি খাদির জামা – কাপড় পরতে শুরু করি। স্কুল ইউনিফর্ম পড়তাম না। গান্ধীজি চরকাকে রাজনৈতিক প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। আমি মনে করি চরকা এখন পরিবেশ সচেতনতার প্রতীক। তুমি যে জিন্স আর টি শার্ট পরেছ, সেটা তৈরি করতে অনেক ইলেকট্রিসিটি পুড়েছে। কিন্তু আমি যে খাদির ধুতি –পাঞ্জাবি পরে আছি, সেটা তৈরি করতে প্রায় জিরো ইলেকট্রিসিটি পুড়েছে। এখন যে সময়ে আমরা বাস করছি, সেখানে পরিবেশকে বাঁচাতেই হবে। এটা আর পছন্দ – অপছন্দের জায়গায় নেই। এটা এখন অনিবার্য যে পরিবেশকে বাঁচাতে হবে। তো খাদি পরা মনে এখন পরিবেশ সচেতনতার প্রচার। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসর পর বম্বেতে দাঙ্গা হয়। ১৮ বা ২০ ডিসেম্বর একটা শান্তি মিছিল হয়েছিল। ওই মিছিলে আমি হেঁটে ছিলাম, হেঁটেছিলেন প্রবীণ গান্ধীবাদী সর্বোদয় নেতা ঠাকুরদাস বাও। ওনার বয়স তখন ৭৫। শান্তি মিছিল শেষে একটা সভা হচ্ছিল রাস্তায়। আমি দেখলাম রাস্তার এক কোনে বসে ঠাকুরদাস চরকায় সুতো কাটছেন। আমি ওনার পাশেয় বসে পড়লাম। ওনার কাছ থেকে জানলাম বম্বেতে মহাত্মা গান্ধী যেখানে থাকতেন সেখানে চরকা শেখানোর ক্লাস হয়। আমি ওই
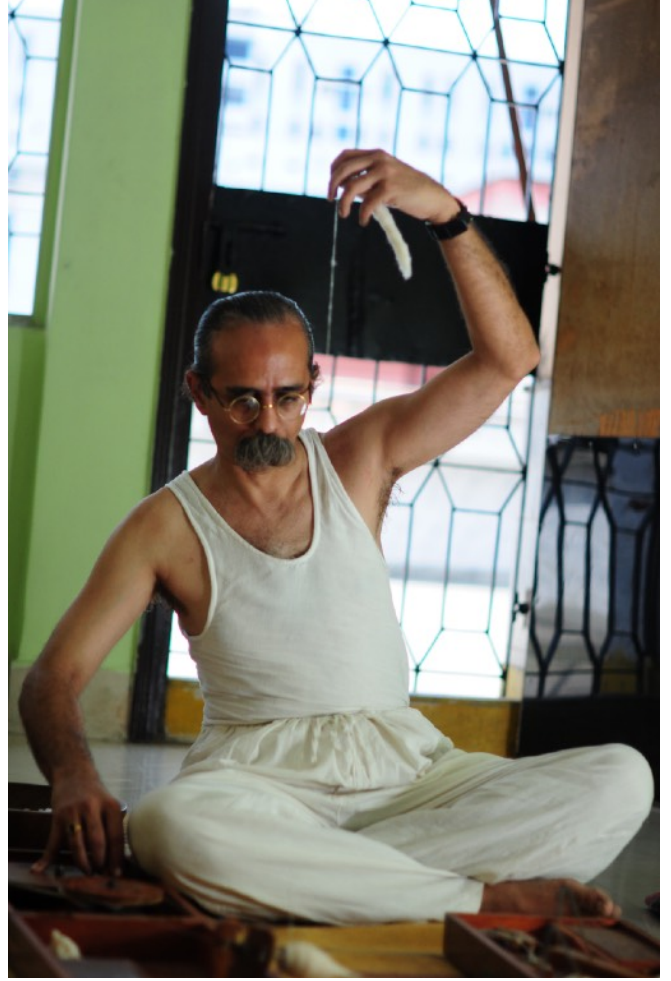
ক্লাস নাইন থেকে আমি খাদির জামা – কাপড় পরতে শুরু করি। স্কুল ইউনিফর্ম পড়তাম না। গান্ধীজি চরকাকে রাজনৈতিক প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। আমি মনে করি চরকা এখন পরিবেশ সচেতনতার প্রতীক। তুমি যে জিন্স আর টি শার্ট পরেছ, সেটা তৈরি করতে অনেক ইলেকট্রিসিটি পুড়েছে।

ক্লাসে ভর্তি হয়ে গেলাম। চরকায় সুতো কাটতে শিখলাম।

এটা কি তোমার কাছে এক ধরনের মেডিটেশন ?

একদম তাই। মহাত্মা গান্ধী বলতেন, 'ইফ আই ডিড নট স্পিন, আই উড নট থিংক'। এখন প্রতিদিন ২ ঘন্টা ঘরে চরকা চালাই। একজন গায়ক বা বাদক যেমন রোজ তার সঙ্গীত বা বাদ্যটি নিয়ে রেওয়াজ করে, আমিও তেমনি চরকা নিয়ে রেওয়াজ করি।

তুমি কি জানো এরকম একটি আইন আছে যে আনসেন্সর্ড ফিল্ম ব্যক্তিগত উদ্যোগে একবারই সর্বাধিক ১১জনকে দেখানো যায়? তাহলে রেঞ্জ আর্ট গ্যালারিতে তোমার ফিল্মের নিয়মিত প্রদর্শনী করা আইনত সম্ভব নয়। সেই জন্যই দুদিন দেখানোর পর শো বন্ধ করতে হয়।

হ্যাঁ, আইন আছে। কিন্তু আরও একটা কথা আছে। ফিল্মটা যদি একটা আর্ট ওয়ার্ক হিসেবে দেখানো হয়, তাহলে সেন্সরের প্রশ্নটি এড়ানো যায়। আমার কাজ সব সময় আর্ট স্ক্রিনিং হিসেবেই দেখানো হয়, ফিল্ম হিসেবে নয়। সিনেম্যাটোগ্রাফি অ্যাক্টে ফিল্মের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে, সেটা একটি ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা, তার সঙ্গে লাভ – ক্ষতি জড়িয়ে আছে। আমার কাজটা তো তা নয়। আমার কাজটা ভিডিও আর্ট / ফিল্ম আর্ট , তাহলে ওই সংজ্ঞা আমার ক্ষেত্রে খাটে না। আমি ফ্রি তে মানুষকে আমার কাজটা দেখাচ্ছি। একটা শো সর্বাধিক ৪০ জন দেখতে পারে। পুরো আইনটাতে পরিস্কার করে কিছু বলা নেই। রাষ্ট্র যখন খুশি এটা বন্ধ করে দিতে পারেতাই তো এখন অমল পালেকর সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টা ফেলেছে, যাতে আইনে স্পষ্ট করে সব কিছু বলা হোক। রেঞ্জ গ্যালরিতে যেত হল সেটার কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় আমরা এখন এমন একটা আবহাওয়ার মধ্যে রয়েছি যেখানে একটা মহাভয় ছেয়ে আছে চারপাশে। এবার টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সাংবাদিক লিখল যে আমি সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে তাই আমি এই ভাবে ফিল্মটা দেখাচ্ছি। এটা পড়ে গ্যালারির মালিক ভয় পেল। যদি পুলিশ ওর গ্যালারি বন্ধ করে দেয়। কোর্টে কেস করে। এছাড়া বাড়ির মালিকের সঙ্গেও গ্যালারির মালিকের নানা সমস্যা চলছে। এইসব ঝামেলায় আমার কাজটা দেখানো বন্ধ হল। এবার বাড়ির মালিক এমন ঝামেলা করছে যে গ্যালারিটাও এখন বন্ধ আছে।

তোমার প্রথম ছবি আর 'কল্কিমন্থনকথা'য় নগ্নতা এসেছে। তোমার একটি ফিল্মের চিত্রনাট্য নিয়ে কথা হচ্ছিল সেখানেও নগ্নতা আছে। নগ্নতায় তুমি কী দেখ?

নগ্নতা শব্দটার এতো অপব্যবহার হয়েছে যে এটা নিয়ে দীর্ঘ কথা বলতে হয়। সংক্ষেপে বলি, সিনেমাতে যখন ন্যুডিটি দেখি, সেটা একটা ইরোটিক বডি। হয় সে সেক্স করছে বা সবেমাত্র কপুলেশন শেষ করেছে বা শুরু করতে যাচ্ছে। আমি যে জায়গা থেকে আসছি, সেটা হল নগ্নতার প্রাগাধুনিক ধারণা। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে যে নগ্ন শরীর আমরা দেখি, সেটা কখনই সেক্সুয়াল বডি নয়, সেটা ডিভাইন বডি। 'কল্কিমন্থনকথা' তে যে নগ্নতা দেখিয়েছি তা ওই ডিভাইন বডির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। কুম্ভমেলার প্রেক্ষিতে পুরো ফিল্মটা শুট করা যে কুম্ভতে নগ্নতা কখনই নিষিদ্ধ নয়। অনেক সম্প্রদায়ের

কল্কিমন্থনকথা

সাধুরা সেখানে নগ্ন হয়েই স্নান করেন। এর হল ডিভাইন এসেটিক ন্যুড। কেউ যদি সেটা সেক্সুয়াল বডি হিসেবে দেখে সেটা তার দেখার দোষ। 'কল্কিমন্থনকথা' তে দুই চরিত্র যখন নিজের পরনের কাপড় খুলে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে, ওরা তখন এসেটিক হয়ে যাচ্ছে। আর একটা কথা আছে, আর এক ধরনের ন্যুড বডিকে আমি বলি বহুব্যবহৃত শরীর। মিশেল ফুকো যেমন বলেছেন, যে ভিক্টোরিয়ান ইউরোপ এই ধারণা তৈরি করেছে যে ন্যুড মানেই সেক্সুয়াল। আমাদের দেশেও এই ধারণা আছে। তো যে কথা বলছিলাম, আমি নগ্নতাকে ডিভাইন এসেটিক ন্যুড হিসেবেই দেখি।

এই ফিলমে স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো'র ছায়া আছে। সেটা কেন ?

ছায়া নয়,এটা বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো'কেই অন্যভাবে দেখা। বেকেটের লেখার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের একটা সম্পর্ক। ২০০০ সালে আমি হিন্দিতে একটা শর্ট ফিল্ম করেছিলাম, নাম 'অন্তরা'। অতা বেকেটের একটা নাটক। মাত্র ১৮ লাইনের ডায়ালগেই নাটক শেষ। এটা নিয়ে একটা ২০ মিনিটের সিনেমা হয়েছে। এর আগে কলেজে আমি বেকেটের নাটক অভিনয় করেছি। আমার মনে হয়, আমরা এখন এমন একটা অ্যাবসার্ড সময়ে ঢুকে পড়েছি যে বেকেটকেই আমাদের এখন সবচেয়ে প্রয়োজন। যেখানে কোনও লজিক নেই। বেকেট এই নাটকটা ভেবেছিলেন যখন তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্সে ফ্যাসি বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। আমাদের দেশ হল এমন একটি দেশ, যেখানে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় 'ওয়েটিং ফর গোডো' অভিনীত হয়েছে। আমি 'ওয়েটিং ফর গোডো' ইংরেজি, মারাঠি আর হিন্দিতে দেখেছি। 'কল্কিমন্থনকথা' দুটি বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এক, 'ওয়েটিং ফর গোডো' দুই, কুম্ভমেলা। 'কল্কিমন্থনকথা' তে আমি বেকেটের নাটকটাকে একটা স্প্রিং বোর্ড হিসেবে ব্যবহার

করেছি অ্যাডাপ্টেশন করিনি। ৫০% ফিল্মটা আমি জানতাম, বাকিটা জানতাম না। একটা ১৬ মিমি ক্যামেরা আর ৩০টা ফিল্মের ক্যান নিয়ে চলে গেলাম। খুবই ঝুঁকি নিয়েছিলাম।

তুমি যে কল্কীর রূপকটি ফিলমে এনেছ সেটি তো ঘোর হিন্দুব্রাহ্মণ্যবাদী। পুরাণ অনুযায়ী বিষ্ণুর শেষ বা দশম অবতার হলেন কল্কী। যিনি এসে কলিযুগকে বিনাশ করে সত্যযুগ স্থাপন করবেন। তিনি আসবেন ডানাওয়ালা সাদা ঘোড়ায় চেপে। এক হাতে জ্বলন্ত ধুমকেতুর মতো তলোয়ার আর অন্য হাতে চক্র। তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম স্থাপনের জন্য ম্লেচ্ছ ও বিধর্মীদের নির্মূল করবেন। এতো আর এস এস – এর প্রোগ্রাম!

তুমি একই সঙ্গে ঠিক এবং ভুল। কল্কি অবতার কিন্তু বৈষ্ণব ইতিহাসে একজন বিতর্কিত অবতার। দশ অবতার প্রথম আমরা দেখি মহাভারতে। দশ অবতার বিখ্যাত হয় ভাগবত পুরাণে। যেটা খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে লেখা। প্রথম যে দশ অবতারের তালিকা আমরা পাই, তাতে কল্কি অবতার নেই। কল্কি আসেন মধ্যযুগে, মুসলমান আক্রমণের পর। দশ অবতারের এরকম কোনো স্থায়ী তালিকা কোনদিন ছিল না। পরে তো বুদ্ধকেও এই তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। যেমন কোনো কোনো তালিকায় পরশুরাম অবতার নেই। কোথাও মোহিনীকে স্থান দেওয়া হচ্ছে, কোথাও মোহিনীকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এই পুরো জিনিসটাই চলমান এবং পরিবর্তনশীল। রামায়ণেরই কতগুলো সংস্করণ পাওয়া যায়। বাল্মীকি, তুলসীদাস আর কৃত্তিবাস – এঁদের রামায়ণই আলাদা আলাদা। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রথম হাজার বছরে আমরা কল্কি অবতারের কোনো উল্লেখই পাই না। সেই তুলনায় কল্কি অনেক আধুনিক বলা যায়। কল্কি আসেনি এখনো। আসবে। যেমন গোডো আসেনি এখনো। আসবে। কল্কি একমাত্র অবতার যে আসেনি। তুমি আর এস এস – এর রেফারেন্স দিলে। কিন্তু মনে রেখো আর এস এস কিন্তু মূলত বৈষ্ণবদের সংগঠন। এই হিন্দুত্ব শৈব নয়, শাক্তও নয়। সাভারকর বা হিন্দু মহাসভা যারা আর এস এস তৈরি করেছিল, তারা ছিল মারাঠি চিৎ পাবন ব্রাহ্মণ। এই বৈষ্ণবরাই কিন্তু হিন্দুত্বকে শাসন করছে। ব্রিটিশরাও এই বৈষ্ণব হিন্দুত্ব চেয়েছিল, যেখানে শাক্ত ও শৈবের কোনও স্থান নেই। আজকের হিন্দুত্বর দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখা যাবে এটা জৈন আর বৈষ্ণবদের সমন্বিত একটি ধর্ম। যা আমি মনে করি অসম্পূর্ণ হিন্দুত্ব। এই যে নিরামিষ খাবার নিয়ে উন্মাদনা শুরু হয়েছে এটা জৈনদের জন্য। তাই তোমার উত্তরে বলি যে,না,'কল্কিমন্থনকথা' এই তত্ত্ব বলে না।

তোমার ফিল্মগুলো এক একটা দার্শনিক ডিসকোর্স। এরকম ফিল্ম কর কেন ?

ডিসকোর্স কিনা বলতে পারব না, সেটা দর্শক বলবে। আমার ফিল্মগুলো হল ইংরেজি বুদ্ধিবৃত্তি আর বাংলা ভালবাসার ফসল। সিনেমা বহুদিন ধরে একটা কাহিনিভিত্তিক আর্ট ফর্ম হয়ে আছে। যে কাহিনির জন্ম হয়েছিল উনিশ শতকে, ইউরোপে। বাংলায় সিনেমা আজও সেই কাহিনিভিত্তিক আর্ট ফর্ম হয়ে আছে। এই যে লালদার(সুমন মুখোপাধ্যায়) ফিল্ম 'অসমাপ্ত' রিলিজ হল এই মাসে। সেটাও উপন্যাসকে ভিত্তি করে।কিন্তু ফিল্মের তো একটা আলাদা ভাষা আছে। সেটা কে চর্চা করবে ? আমার ফিল্মে সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার ফিল্মে সময়টা সামনে থাকে আর একটা ন্যারেটিভ পিছনে চলে। দিস ইজ আ পলিটিক্স

অফ টেম্পোরালিটি। এই খেলাটা গোদার খেলেছে, ব্রেসোঁ খেলেছে বা তারকভস্কি, আন্তোনিয়নি,অ্যান্জেলেওপুলুস খেলেছে। আর একজন আমাকে ভীষণ ইনফ্লুয়েন্স করে, সে হল ঋত্বিক ঘটক। উনি ন্যারেটিভকে টেম্পোরালে নিয়ে গিয়ে একটা অন্য মাত্রা দিয়েছেন। আর বলতে হবে মণি কাউলের কথা, ওর ফিল্মেও টাইম যেভাবে ন্যারেটিভ হয়ে ওঠে সেটা আমাকে আকর্ষণ করে। অমিতাভ চক্রবর্তীর 'কাল অভিরতি' আমার প্রিয় ফিল্মগুলোর অন্যতম। কমল স্বরূপ – এর 'ওম দরবদর' – এর কথাও বলতে হয়। আমি বলব আমার ফিল্ম ডিসকোর্স নয় ডিসকার্সিভ। আমি এরকমই ফিল্ম করি। অনেকের বুঝতে অসুবিধে হয়, সে জন্য আমি দুঃখিত ।
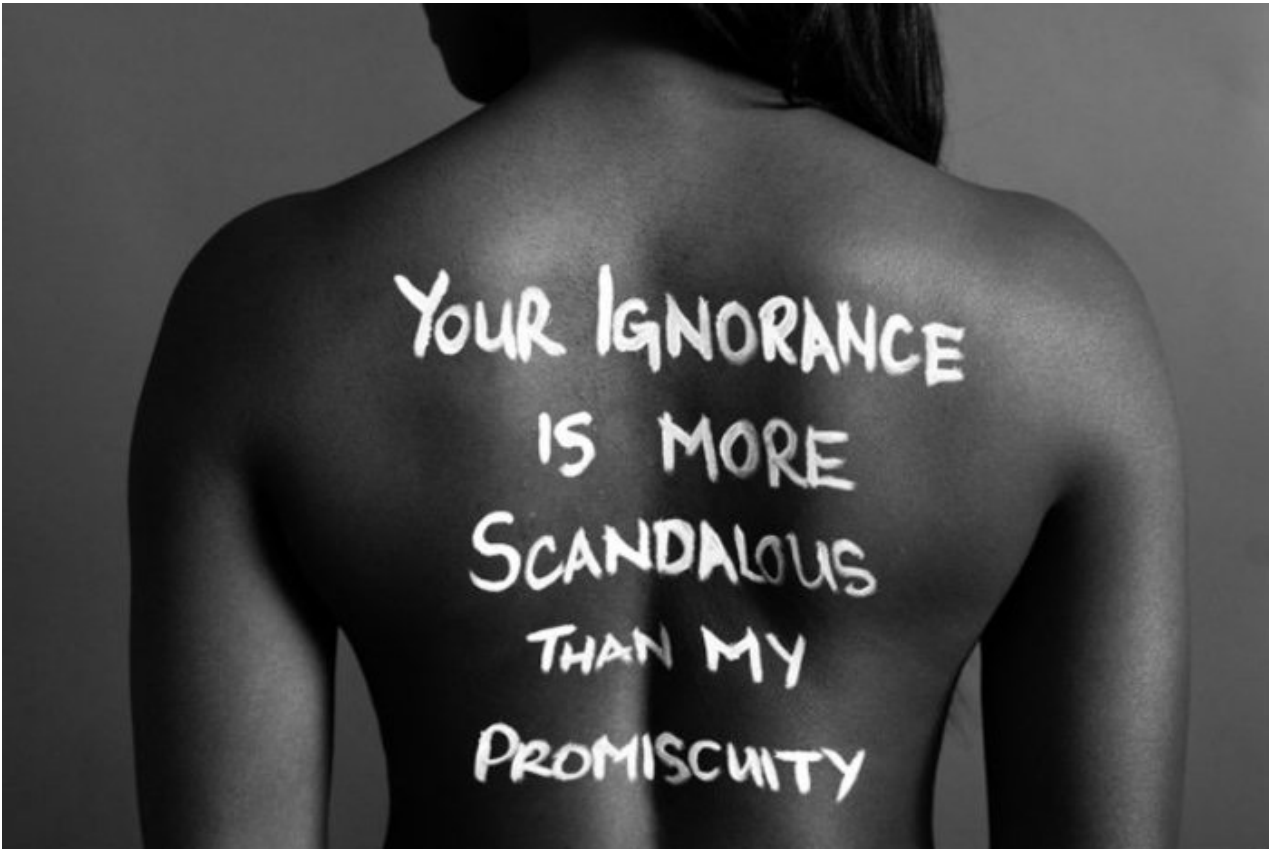
এই শহরে একলা মেয়ে নন্দিনী সোনালী

আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। বাড়ি মফস্বলে,কলকাতা থেকে ঘন্টাখানেকের ট্রেন দূরত্বে। বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা, কিন্তু সেই দিনের সব ঘটনা খুব স্পষ্ট আমার সামনে। কলকাতায় গিয়েছিলাম একটা কাজে,ফেরার পথে টালিগঞ্জ থেকে মেট্রোয় উঠেছি যাব দমদম। রবীন্দ্র সরোবর স্টেশনের পর থেকে হঠাৎ দেখি সবাই আমাকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখছে। মানুষজনের সেই অদ্ভুত দৃষ্টি প্রথমে পাত্তা না দিলেও আস্তে আস্তে শুধু চোখ নয়, বিভিন্ন মন্তব্যও কানে আসতে থাকে বুঝতে পারি আমার জামায় কিছু লেগে আছে, যা ট্রেনের যাত্রীদের মন্তব্যের কারণ। পরণে ছিল জিন্স – এর প্যান্ট আর টপ। জামার নীচে হাত দিতেই টের পাই আমার মেন্সট্রুয়েশন শুরু হয়ে গেছে আর সেই রক্তই আমার জামায়। তারিখটা জানা ছিল, কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না এই স্বাভাবিক বিষয়ে মানুষ কেন এমন করছে। তাঁরা কী ভাবছেন আমি স্বেচ্ছায় এটা করছি? হঠাৎ এক মহিলা বেশ জোরে বলে উঠেছিলেন, 'ছিঃ কী নোংরা মেয়ে'। সেদিন "নোংরা"-র মানে যা বুঝেছিলাম তা হল মেয়েদের মেন্সট্রুয়েশন একটি নোংরা বিষয় অথচ সেটা না হওয়া অস্বাভাবিক। তখন বয়সও কম ছিল,ভয়ে নেমে পড়েছিলাম পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে। কোনভাবে জামা ঢাকার চেষ্টাও করেছিলাম কিন্তু কারুর চোখ থেকে বাঁচিনি। পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথে একটি গাছের নীচে বসে পড়ি, দাদাকে ফোন করি, দাদা বাইক নিয়ে এসে আমাকে বাড়ি নিয়ে যায়। বাইকে ওঠার আগে পর্যন্ত ওই ফুটপাথে বসে বুঝতে পারি ছেলেদের চোখ শুধু ঐ রক্তেই আটকায় নি তাদের চোখে আমি তখন খাবারে পরিণত হয়েছিলাম। ওই বিকেলে

পারলে তখনই আমাকে তুলে নিয়ে যায় তারা। বাড়ি ফিরে ওই ঘটনা আমি ফেসবুকে পোস্ট করি। পোস্টটি ভাইরাল হয়, বেশির ভাগ মানুষ আমার পক্ষে ছিলেন, বিপক্ষেও অনেকে ছিলেন। কেউ ফেসবুকে এটি অশ্লীল পোস্ট বলে রিপোর্ট করেন ফেসবুক আমাকে ব্লক করে।

এখন কলকাতায় একা থাকছি,বছর দুয়েক,পেইং গেস্ট হিসেবে। কাজের জন্য রাত করে ফিরতেও হয়। আমি অভিনয় আর মডেলিং করি আর তার জন্য কলকাতায় থাকতে হয়। যখন কলকাতায় থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম, ঠিক করলাম দক্ষিণ কলকাতায়ই থাকব। আমার কাজের ক্ষেত্রে দক্ষিণ কলকাতা থেকে যাতায়াতের কিছুটা সুবিধা এবং ভেবেছিলাম দক্ষিণ কলকাতায় মানুষজন কিছুটা অন্য ধরণের। দক্ষিণ কলকাতায় বেশ রাতের দিকেও মানুষজনের যাতায়াত থাকে,কলকাতায় যখন একা থাকতে আসি তখন ভেবেছিলাম এতে ভালোই হবে। ধীরে ধীরে ভুল ভাঙে দক্ষিণ কলকাতার মানুষরা নিজেদের যতোটা খোলা মনের দেখায় তারা তেমন নয় কিন্তু অভিজ্ঞতা বলছে কলকাতার উত্তর – দক্ষিণ –পূর্ব – পশ্চিম একই রকম।

একদিন রাতে ঘরে ফিরছি,দেখি কয়েকটা ছেলে আমার পিছু নিয়েছে,তা কলকাতা একটা জিনিস শিখিয়েছে,নিজের রক্ষা নিজে করো নাহলে রেপ হও। তাই নিজের রক্ষায় কিছু জিনিষ ব্যাগে রাখি;ওদের দেখে ভাবছিলাম ব্যাগ থেকে পেপার স্প্রে বের করব। কিন্তু দেখলাম আলোর রাস্তায় তারা আর নেই সেদিন কলকাতা বোঝালো অন্ধকারে মেয়েদের পেলে এই শহর বেশি চুলকোয় আলোতে চুলকানিটা একটু কমেই যায়। একা থাকতে গিয়ে কলকাতার খারাপটাই বেশি দেখেছি। ক্লিভেজ দেখার জন্য গায়ের উপর হামলে পরা ছেলেদের যখন দু –চারটে কড়া কথা বলি তখন মুখ ঘুরিয়ে যাওয়ার সময় তারা আমাকে খানকি বলে যায়।

দক্ষিণ কলকাতায় বেশ রাতের দিকেও মানুষজনের যাতায়াত থাকে,কলকাতায় যখন একা থাকতে আসি তখন ভেবেছিলাম এতে ভালোই হবে। ধীরে ধীরে ভুল ভাঙে দক্ষিণ কলকাতার মানুষরা নিজেদের যতোটা খোলা মনের দেখায় তারা তেমন নয় কিন্তু অভিজ্ঞতা বলছে কলকাতার উত্তর – দক্ষিণ –পূর্ব – পশ্চিম একই রকম।

আরও একটা ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল, একটি ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল বহু বছরের, তাই বিশ্বাসটাও ছিল তার উপর। সে পড়াশোনার জন্য থাকত কলকাতায় পেইং গেস্ট । আমি মাঝেই মাঝেই সেখানে যেতাম। ২০১২ সালে একবার কলকাতা থেকে বাড়ি ফেরার সময় সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়ি, সঙ্গে সেই বন্ধুটি। তার অনুরোধে যেতে হয় তার ঘরে। তার ঘরে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, পরের দিন ঘুম ভাঙে নিজের বাড়িতে। জানতে পারি ওই ঘুমন্ত অবস্থায় সেই বন্ধু বাড়ি দিয়ে গেছে। তাকে ফোন করলে সে বলে, 'হ্যাঁরে খানকি বল। ঘুম ভাঙল' ? আমি অবাক হয়ে তাকে বলি, 'এভাবে কথা বলছিস কেন'? উত্তরে সে বলে, 'তোকে

অনেকদিন ধরে চোদার ছক করছিলাম, কাল চুদেছি। আমার কাছে তোর ন্যুড ভিডিও ক্লিপিংস আছে। যখন শুতে চাইব চলে আসবি। নইলে ফেসবুকে সব লিক করে দেব'। বুঝতে পারি আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে এইসব করেছে। এই ব্ল্যাকমেলের সামনে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাইনি, সব কিছু একাই সামলে নিয়েছি। আমি একা একা রাস্তায় ঘুরতে ভালোবাসি আর মাসের শেষে পকেটটাও কমজোরি হয়ে যায়। তাই অনেকটা রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে ঘরে ফিরছি, তখন প্রায় রাত ১২টা। কিছু প্রাইভেট কার আর ট্যাক্সি ছাড়া রাস্তা প্রায় ফাঁকা,হঠাৎ খেয়াল করি একটি প্রাইভেট কার খুব আস্তে চালাচ্ছে এবং বলা যায় আমার পাশে পাশেই চলছে,গাড়িতে লাউড মিউজিক বাজছে,ভেতরে দুটো ছেলে। যদিও আমি আমার মতোই হেঁটেই ফিরি তবে সেই গাড়িটা যাওয়ার আগে বলে, 'চলো কোথাও ঘুরে আসি। যা রেট তার থেকে বেশিই দেব'। কথাগুলো গায়ে মাখিনি কারণ এদের কথা শুনলে আমার জীবনটা থেমে যাবে।আমি খোলামেলা পোষাক পরি আর পরতে ভালোবাসি,আমি সবার সাথে খোলামনে কথা বলি,তাই অনেকেই ভেবে ফেলে আমি খুব সহজেই

পরতে ভালোবাসি,আমি সবার সাথে খোলামনে কথা বলি,তাই অনেকেই ভেবে ফেলে আমি খুব সহজেই বিছানায় চলে যাই। সেক্স খুব স্বাভাবিক বিষয় সেটা অস্বাভাবিক করে তুলেছে কিছু মানুষ।

আমি এই সমাজকে মানিনি মানবোও না। হাস্যকর ধ্যানধারণা আর গোঁড়ামি নিয়ে তৈরি এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, না না বালের সমাজ। এই বালের সমাজ আমার জীবন থামাতে পারবে না,এই কলকাতায় বন্ধুবেশী পুরুষের হাতে ধর্ষিত হয়েও আমি থামি নি,আমি থামবো না,আমি এগিয়ে যাবো আমার মতো। এই হল কলকাতায় একা থাকা একটি মেয়ের দৈনন্দিনের সত্যি।

ও হ্যাঁ,ধর্ষিতা জেনে কেউ সহানুভূতি জানাবেন না। ওটার কোনো প্রয়োজন নেই । আমার জীবন আমি গোছাতে জানি।